বি. প্র. পর্য্যায়—৩

স্বরাজ-সাধনা

বা

রাষ্ট্র-পরিচয়।



স্বরাজ কেহ কাহাকে দান করিতে পারেনা, তাহা হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। বিদ্বেষ, অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতা স্বরাজ-সাধনার প্রধান অন্তরায়। দেশবাসীর আন্তরিক একতা ও মমত্ব-বোধের উপরেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।



শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বি. প্র. ভাণ্ডার

বসন্ত-কুটীর, গোন্দলপাড়া,

চন্দননগর।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

ঘর ও পর—মূল্য এক টাকা।

প্রবাসী বলেন—বইখানিতে ২২ পরিচ্ছেদে ঘরের কথা ও পরের সঙ্গে সম্পর্কের কথা আলোচনা করিয়া লেখক মোটামুটি বলিতেছেন—পরের সাহায্য ও সহকারিতা ভিন্ন ঘর চলে না; পরের সহিত ঘরের ভেদ ঘুচিয়া যায় প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মের নিষ্ঠার দ্বারা; সমাজে ছোট বড় কেউ নয়, সবাই নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে বড়......সমাজের হিতকর্ম্মমাত্রই বড় কায, সমাজের অহিতকর্ম্মই নীচ কায......মনুষ্যত্বই অর্জ্জনীয় ও সম্মানীয়, তার জন্য চাই নিষ্ঠা ও সংযম। সকল দোষের আকর—আলস্য ও উপেক্ষা। আমরা বিশেষভাবে উপেক্ষা করি মেয়েদের; মেয়েরা যে ছেলেদেরই মত সমাজদেহের অচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহা আমরা ভুলিয়া ফল পাইতেছি হাতে হাতে......সমাজের সকল লোকের বুদ্ধির চালনা থাকিলে, জ্ঞানচর্চ্চা থাকিলে অপবুদ্ধি দেশবাসীর মধ্যে বাসা বাঁধিতে পারেনা। জ্ঞানচর্চ্চা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, বলচর্চ্চাও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে।... সমাজে ধনসাম্য কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে। ফল কথা, আমাদিগকে মানুষ হইয়া স্বাধীন হইতে হইবে—মানুষ মানেই সম্পূর্ণ মানুষ, মুক্তি মানেই সম্পূর্ণ মুক্তি।

এই গ্রন্থখানি সুচিন্তিত কথায় ভরা, সুলিখিত; বড় ভাল লাগিল; সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

ব্যক্তি ও সমাজ—মূল্য ছয় আনা।

গুরুগোবিন্দ সিংহ—মূল্য আট আনা।

রাষ্ট্রতত্ত্ব (যন্ত্রস্থ)—মূল্য ছয় আনা।

ভারতের মেয়ে (যন্ত্রস্থ)—মূল্য ছয় আনা।

সেকেলে মেয়ে (যন্ত্রস্থ)—মূল্য ছয় আনা।

ভূমিকা

'ঘর ও পর' ও 'ব্যক্তি ও সমাজ'এ সাধারণভাবে যে-সকল কথা আলোচনা করিয়াছি, সে সকলেরই একটি বিশিষ্ট দিক্ লইয়া রাষ্ট্রপরিচয়ের সৃষ্টি। রাষ্ট্র-পরিচয়ের আরও একটি নাম রাখিয়াছি—স্বরাজ-সাধনা। কারণ, রাষ্ট্র ও স্বরাজ প্রকৃতপক্ষে একার্থবোধক শব্দ। ইংরেজীতে যাহাকে সেল্‌ফ্ গভর্মেণ্ট বলে, স্বরাজ প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সেল্‌ফ্ গভর্মেণ্টের গোড়ার অর্থ যাহাই হউক, পারিভাষিক অর্থে উহা পরাধীনতাসূচক।

অধ্যাপক ষ্টিফেন লেকক-প্রণীত 'এলিমেণ্টস্ অব্ পলিটিকাল সায়েন্স' গ্রন্থকেই প্রধানত অবলম্বন করিয়া আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। ইহার কতকাংশ আমি রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ থাকিবার কালেই লিখিয়াছিলাম। বিষয়টি সহজ করিয়া বুঝাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই; কিন্তু কতদূর সফল হইয়াছি বুঝিতে পারিলাম না। দেশে রাষ্ট্রবোধ পরিস্ফুটনের পক্ষে যদি ইহা অনুমাত্রও সাহায্য করে, তাহাহইলে চেষ্টা সার্থক বোধ করিব।

এই গ্রন্থের উন্নতি বা সংস্কার কল্পে যদি কেহ কোন সুপরামর্শ দেন, তাহাহইলে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। ইতি—১লা শ্রাবণ, ১৩২৮।

গ্রন্থকার।

প্রকাশক

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।

সাথী প্রেস

২৯ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

শ্রীহেমচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

[মূল্য ছয় আনা মাত্র।

স্বরাজ-সাধনা



অবতরণিকা

স্বরাজ, স্বরাট্ বা রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য যে কি জিনিষ, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্টধারণা পূর্ব্ব হইতে দেশবাসীর মনে উজ্জ্বল হইয়া না উঠিলে স্বরাজলাভ একটা ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষামাত্রেই পর্য্যবসিত থাকিবে। আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ নিষ্ক্রিয় থাকে, যতক্ষণ কার্য্য ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ আকাঙ্ক্ষার সার্থকতায় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে। আচণ্ডাল ও আনারী সারা দেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবুদ্ধি জাগিয়া না উঠিলে, দেশের মধ্যে প্রকৃত একতার উদ্ভব হইতে পারেনা। আর, যতক্ষণ না দেশবাসীদের মধ্যে আন্তরিক একতা জাগিয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পরিণত হইতে বাধ্য, অথবা কোন আকস্মিক কারণে স্বরাজলাভ ঘটিলেও তাহা রক্ষা করিবার শক্তি দেশবাসীর থাকিবে না। এদেশ তো চিরকালই পররাষ্ট্রের মন যোগাইয়া চলে নাই। একদিন এদেশও স্বরাজের মহিমায় উদ্ভাসিত ছিল। তবে সে মহিমা, সে অনধীনতা ঘুচিয়া গেল কেন? যদি সমাজের সকল স্তরের ও সকল অঙ্গের মধ্যে একটা আন্তরিক যোগ থাকিত, যদি পুরুষের মত নারীরাও দেশের কর্ত্তব্যের আবশ্যকতা সম্যক্ বুঝিতে পারিত, যদি দেশের জনসাধারণ কেবল আদেশবাহক ভৃত্যমাত্র না হইত, যদি দেশটাকে গোটাকতক রাজার দেশ বলিয়া সকলে না বুঝিত, তাহাহইলে এমন ঘটনা কখনই

ঘটিত না। দেশ যে আমার, রাজা আমার প্রতিনিধি মাত্র, রাজ-পুরুষেরা আমার সেবক ভিন্ন আর কিছুই নয়—এই বোধ আজও দেশবাসীদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। এ বোধ যখনই ফুটিয়া উঠিবে, তখনই স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে ফলবতী হইবার পথে এক পদ অগ্রসর হইবে; তদগ্রে নহে। আর ইতিহাসের ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ভিন্ন সে-বোধ জাগিবার কোন সহজ পন্থা বা সম্ভাবনাও তো নাই।

দেশ আমার; আর আমার সেই দেশ আমার ইচ্ছানুযায়ী শাসিত ও পরিচালিত হউক, এই ভাব একবার মনে জাগিলেই তখন প্রতিবেশীর হিতের দিকে লক্ষ্য পড়াই সম্ভব। কারণ, আমার একলার চেষ্টায়, আমার দেশ রক্ষিত শাসিত বা পরিচালিত হইতে পারেনা, সে-আমি যত বড়ই বীর, পণ্ডিত বা মহাপুরুষ হই না কেন। এইজন্য আমাকে বাধ্য হইয়াই প্রতিবেশীদের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তাহাদের সহযোগিতা ভিন্ন আমি, যাহা আমার বলিতেছি, তাহা আমার করিয়া রাখিতে বা তুলিতে পারিব না। যাহার সহযোগিতা বাঞ্ছা করি, যাহার সহযোগিতার উপর নির্ভর করা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ব দেখাইতে আমি ন্যায়ত ধর্ম্মত বাধ্য। সেই বাধ্যতা যদি আমি না মানি, তাহাহইলে আমি নিজের চক্ষেই—নিজের কাছেই পাপগ্রস্ত। আর, আজ আব্রাহ্মণ দেশের সকলেই নিজের নিজের কাছে এইরূপই পাপগ্রস্ত। তাহারা প্রত্যেকেই আত্মপ্রবঞ্চক। আমরা পরস্পরে পরস্পরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের হিত সাধিতে উৎসুক, যদিও মনে মনে একথাও স্বীকার করি যে এরূপ স্বার্থপরতায় নিজেরও হিত হয় না পরেরও হিত হয় না। পরের হিতকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের হিত খুঁজিতে যাওয়া যে মহাভ্রম, মায়া বা মরীচিকার চরম দৃষ্টান্ত, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। তাই আমরা এত হীন, এত দুর্ব্বল।

আমাদের বর্ত্তমান হীনতাকে ও দুর্ব্বলতাকে দূর করিতে হইলে, বাস্তবিকই সরলভাবে স্বরাজসাধনায় ব্যাপৃত হইতে হইবে; আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিবে, লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া এই মন্ত্র ঘোষণা করা—**দেশ বলিতে যাহা মনে কর, তাহাকে বাস্তবিকই যদি স্বরাজে পরিণত করিতে চাও, তাহাহইলে হৃদয় হইতে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা মুছিয়া ফেলিয়া আজ যাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছ তাহাকে কোলে তুলিয়া লও, আপনার ভাইয়ের মত সম্মান কর; আর, যাহার স্বাভাবিক সাধুত্বে সন্দিহান আছ এবং সেই নীচ ও অমূলক সন্দেহের বশে যাহাকে জগতের সকল সংস্পর্শ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছ, তাহাকে অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর এবং তাহার হিতাহিত তাহারই হাতে ছাড়িয়া দাও; অধিকন্তু নিজের দৃষ্টান্তের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণকে শিখাও—সহযোগি যে, সে কখনও পর নহে, সে চিরকালই আপনার; তাহাকে আপনার ভাবিতে শিখাই, আপনার করিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামাই যথার্থ মনুষ্যত্ব আর এইরূপ মনুষ্যত্ব ভিন্ন স্বরাজ কখনও লভ্য নহে।**

কিন্তু কেবল এইটুকু করিলেই যথেষ্ট হইবে না। স্বরাজ বা স্বরাট্ ভিন্ন কাহারই যে সম্যক্ উন্নতি ঘটিতে পারেনা, তাহা ইতিহাসের ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে সুস্পষ্ট করিয়া সকলকে বুঝাইতে হইবে। বুঝাইতে হইবে—স্বরাজ বা স্বরাট্ একটা কৃত্রিমব্যবস্থামাত্র নয়, তাহার মধ্যে যতটা কৃত্রিমতাই থাকুক না তাহা দেশবাসীর সুচরিত্রতার ও পরস্পর-নির্ভরতাবৃত্তির একটা স্বাভাবিক বাহ্যবিকাশ মাত্র। যে-দেশের অধিবাসীরা চরিত্রে যত অধিক উন্নত এবং পরস্পরের হিতসাধনে যত

অধিক আগ্রহান্বিত, সে-দেশের স্বরাজ তত অধিক উন্নত জীবন্ত ও প্রবল। দেশবাসীর সুচরিত্রতা ও পরস্পরনির্ভরশীলতাই যে স্বরাজের প্রাণপক্ষী তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে। আমরাও যখন চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম, যখন পরস্পরের হিতসাধনকে নিজের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে বলি দিয়াছিলাম, তখন—কেবল তখনই আমাদের স্বরাজের অধোগতি আরম্ভ হয় এবং আমরা ক্রমশ পররাষ্ট্রের অধীনতা যে অপমানজনক, সে বোধ হইতেও বঞ্চিত হই।

আমাদের এই-যে অজ্ঞানতা, এই-যে আত্মসম্মানবোধরাহিত্য, তাহা দূর করিতেই হইবে। এবং সেইজন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত ইতিহাসের ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—স্বরাজ কেহ কাহাকেও দান করিতে পারেনা, তাহা হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। মনুষ্যত্ব লাভের উপায় যেমন স্বরাজ, তেমনি কতকটা পরিমাণে মনুষ্যত্ব লাভ না করিলেও স্বরাজ লাভ ঘটে না। এইজন্যই স্বরাজ-সাধনা আর মনুষ্যত্ব-সাধনা একই কথা। আজ আমাদের স্বরাজ-সাধনার দিন আসিয়াছে। তাই রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি ও রাষ্ট্রের সহিত সমাজের সম্পর্ক কি, তাহা খুব ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

স্বরাজ-সাধনা।



(১)
রাষ্ট্রের প্রকৃতি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, রাষ্ট্র কি ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিদের সম্পর্ক কি, তাহাই নির্দ্ধারণ করা। রাষ্ট্র ও রাজ্য গোড়ায় একার্থক শব্দ হইলেও এবং প্রাচীনকালে রাষ্ট্র অপেক্ষা রাজ্যশব্দের অধিক প্রচার থাকিলেও অধুনা কিন্তু রাষ্ট্র শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ—স্বাধীনতা। রাজ্য কিন্তু স্বাধীন না হইলেও চলে। মিশর একটা রাজ্য মাত্র, রাষ্ট্র নয়; কারণ, উহা স্বাধীন নয় অথবা স্বাধীন হইলেও নামে স্বাধীন, কার্য্যত নয়। অন্যপক্ষে, জাপান একটা রাজ্যও বটে, রাষ্ট্রও বটে। কারণ, জাপান স্বাধীন; উহার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার জাপান ভিন্ন আর কোন রাজ্যের বা রাষ্ট্রের নাই। আবার রাষ্ট্র একটা রাজ্য কেন, বহু রাজ্যের সমষ্টি বা সাম্রাজ্যও হইতে পারে; যেমন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য বা মার্কিন। মার্কিন বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যের সমষ্টি। এই সকল রাজ্যের কোনটিই রাষ্ট্র নয়, অথচ উহাদের সকলের সমবায়ে মার্কিন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ঐরূপ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মণরাষ্ট্র বলিতে প্রুসিয়া বেডেন প্রভৃতি বহু রাজ্যের সমষ্টি বুঝাইত। জাপান রাষ্ট্রও একটি সাম্রাজ্য।

স্বাধীনতা রাষ্ট্রের প্রধানতম লক্ষণ হইলেও একমাত্র লক্ষণ নয়। একদল লোক যদি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাহইলেও তাহাদের সমবায়কে রাষ্ট্র বলা যায় না। এইজন্যই

বিভিন্নদেশবাসী যাযাবর বেদেদের সঙ্ঘ রাষ্ট্র নয়। রাজ্যের মত রাষ্ট্রও স্থানসাপেক্ষ। যখন কতকগুলি লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি দেশবিশেষে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হয়। কিন্তু তাহারা কেবল সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই চলিবে না, তাহাদের মধ্যে স্থানগত ও সঙ্ঘগত একতা বা সংহত ভাব থাকা চাই। কেবল স্থানগত একতা যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট হইলে প্রাচীন গ্রীসে বা ভারতে এতগুলি রাষ্ট্র থাকিতনা এবং ষ্টুয়ার্ট রাজারা ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকিত না। কেবল সঙ্ঘগত একতা যে যথেষ্ট নয়, তাহার দৃষ্টান্ত য়ুদীরা।

সঙ্ঘ বলিতে আমরা কি বুঝি? কতকগুলি লোক একত্র হইলেই যে তাহাদের সমবায়কে সঙ্ঘ বলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সঙ্ঘ বলিতে একটা শৃঙ্খলার ভাব মনে আসে। যখন সমবেত লোকেরা একটা নিয়ম মানিয়া চলে, একটা শাসন-পদ্ধতির অধীন হয়, তখনই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। শাসননিরপেক্ষ সম্মিলন সঙ্ঘ নয়, জনতামাত্র। জনতা লইয়া রাষ্ট্র হয় না।

সুতরাং দেখিতেছি, রাষ্ট্র বলিতে আমরা এমন কতকগুলি লোক বুঝি, যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দেশে বসবাস করে, একটি নির্দ্দিষ্ট শাসনপদ্ধতি মানিয়া চলে এবং সেই শাসনকার্য্যে বাহিরের কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না।

বাহিরের কেহ যদি জোর করিয়া সে-দেশ দখল করে, এবং তাহাদিগকে নিজের শাসন-পদ্ধতির অধীন করে, অথচ নিজে সেই দেশে থাকিয়া যায় ও সেই দেশবাসী হইয়া উঠে, তাহাহইলেও কিন্তু রাষ্ট্র তাহার রাষ্ট্রত্ব হারায় না। কারণ, রাষ্ট্রের প্রধানতম লক্ষণ যে স্বাধীনতা তাহাতে ঘা লাগে না। এইজন্যই পাঠান-ভারত ও মোগল-ভারত রাষ্ট্রই ছিল।

কিন্তু যদি জেতা নিজে স্বাধীন না হয়, সে যদি অপরের অনুজ্ঞা মত চলিতে থাকে, তাহাহইলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রত্ব হারাইয়া ফেলে। বৃটিশ-ভারত স্বাধীন নয়, বড়লাটকে ইংণ্ডের ভারতসচিব বা পার্লিমেণ্টের নির্দেশ মত চলিতে হয়, এইজন্যই বৃটিশভারত আর যাহা হউক রাষ্ট্র নয়। যদি কখন বৃটিশ-পার্লিমেণ্ট বৃটিশ-ভারতকে স্বরাজ প্রদান করে, তাহাহইলেও উহা রাষ্ট্র হইবে না, পূর্ব্ববৎ একটা বৃহত্তর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই থাকিবে। বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা রাষ্ট্র। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যেমন উহার একটা অংশ, বৃটিশভারতও উহার তেমনি একটা অংশ; তবে নগণ্য অংশ। কানাডা প্রভৃতির যেটুকু আত্মকর্তৃত্ব আছে, বৃটিশভারত এখনও তাহা লাভ করে নাই।

পূর্ব্বে যে শাসন-পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে তাহা সময়বিশেষে নির্দ্দিষ্ট হইলেও চির-নির্দ্দিষ্ট হয় না; সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যখন যাজককুল প্রাধান্য লাভ করে, তখনকার শাসন-পদ্ধতি আর যখন সাধারণ প্রজাবৃন্দ সকলেই শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার লয়, তখনকার শাসন-পদ্ধতি কখনই একরূপ হইতে পারে না। রাষ্ট্রের নায়ক যখন একজন বা কয়েকজন হয়, তখনও উহার অন্যরূপ শাসন-পদ্ধতি দেখা যায়।

যাঁহারা শাসন পরিচালন করেন, তাঁহাদিগের সমবায়কে শাসনচক্র বলে। চলিত কথায় সরকারবাহাদুর বা রাজসরকার বলিতে এই শাসন-চক্রকেই বুঝায়। শাসনচক্র আর রাষ্ট্র এক নয়। শাসনচক্র রাষ্ট্রের নায়ক বা পরিচালক মাত্র।

রাষ্ট্র এবং নেশনও এক নয়। নেশন ইংরেজীতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও উহার 'জাতি' অর্থ আর কখনও বা 'রাষ্ট্রসমাজ' অর্থ দেখা যায়। যাহারা সমভাষী ও সমবংশোদ্ভব তাহারাই জাতি। ভারতের হিন্দু

ও মুসলমান ও দেশী খৃষ্টানেরা একেবারে সমভাষী না হইলেও সমবংশোদ্ভব বটে। তাহাদের সকলের মধ্যে একই রক্ত অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাহারা সকলে ঠিক সমভাষী না হইলেও যে একজাতি তাহা আজ নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের অজ্ঞাত নাই। এরূপ একজাতিকে কখন কখন নেশন বলা হয় বটে, কিন্তু উহা নেশনের পারিভাষিক অর্থ নয়। এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া যাহারা রাষ্ট্রকার্য্যের পরিচালন-ব্যাপারে কোন কথা বলিবার অধিকার রাখে, কেবল তাহাদের সমষ্টিকেই নেশন বলে। রোমান সাম্রাজ্যে বা গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিতে সাধারণত দুই শ্রেণীর লোক থাকিত, একদল রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে কথা কহিতে পারিত আর একদল পারিত না। যাহারা পারিত না, তাহারা বিদেশী না হইলে তাহাদিগকে দাস বলা হইত। আর যাহারা পারিত তাহাদিগকে লইয়া নেশন হইত। রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে কথা কহিবার অধিকার না পাইলে কোন জাতি নেশন হয় না। এইজন্যই নেশনের বাঙ্গলা রাষ্ট্রসমাজ করাই ঠিক।

যাহাদের লইয়া নেশন, তাহাদের প্রত্যেককে বলে 'সিটিজেন'। 'সিটিজেনের' বাঙ্গালা রাষ্ট্রপ্রজা।

রাষ্ট্রে যাহারা বাস করে, রাষ্ট্রনায়ক ব্যতীত তাহাদের সকলকেই প্রজা বলে। প্রজা দ্বিবিধ—রাষ্ট্রপ্রজা ও অধীনপ্রজা। রাষ্ট্রের শাসন কার্য্যে কথা কহিবার অধিকার যে প্রজার নাই, সেই প্রজাই অধীনপ্রজা। সেদিন পর্য্যন্ত রুষ-রাষ্ট্রের ও তুরস্ক-রাষ্ট্রের প্রজারা অধীনপ্রজা ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বৃটিশ দ্বীপের অধিকাংশ প্রজাই অধীনপ্রজা ছিল। ইহার পর হইতে অধীনপ্রজার সংখ্যা ক্রমশ কমাইয়া ফেলা হইতেছে।

রাষ্ট্রনায়কত্ব যদি বংশগত হয় (যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যে), তাহাহইলে রাষ্ট্র-নায়ককে যেমন রাজা, সম্রাট, জার, কৈজর, সুলতান, খেদিভ প্রভৃতি বিশিষ্ট নামে অভিহিত করা হয়, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে

তাঁহাকে প্রজাদিগহইতে চিরবিভিন্ন বলিয়াই গণ্য করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কত্ব যদি বংশগত না হয় এবং রাষ্ট্রপ্রজারা যদি নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে তাহা কিছুদিনের জন্য দান করে, তাহাহইলে রাষ্ট্র-নায়ক যে আখ্যাই লউন না কেন রাষ্ট্রপ্রজাই থাকেন, তবে কিছুদিনের জন্য প্রজাদিগহইতে বিভিন্নতা লাভ করেন মাত্র।

রাষ্ট্রসমাজ আর সমাজ যে এক নয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। সমাজের সহিত কোন দেশ বা রাষ্ট্রবিশেষের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। মুসলমান সমাজ বলিলে ভারতের মুসলমানকে যেমন বুঝাইবে আবার পারস্য, তুরস্ক, মিশর বা চীনের মুসলমানকেও তেমনি বুঝাইবে। অথচ দেশ বা রাষ্ট্রের দিক্ হইতে তাহাদের মধ্যে কোন মিল নাই। আবার এক সমাজের লোকেরা যেমন একাধিক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে, তেমনি একাধিক সমাজের লোকেরাও এক রাষ্ট্রসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। শ্লাভ-সমাজের লোকেরা যেমন রুষ-রাষ্ট্রে আছে, তেমনি সার্ভিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রেও আছে; জর্ম্মণ সমাজের লোকেরা যেমন জর্ম্মণ সাম্রাজ্যে তেমনি অষ্ট্রীয়া-হঙ্গেরি-রাষ্ট্রেও ছিল। ঐরূপ পোল-সমাজের লোকেরা ১৯১৯ সালের পূর্ব্বে কতক অষ্ট্রীয়া-হঙ্গেরি রাষ্ট্রে, কতক রুষ-রাষ্ট্রে আর কতক জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যে বাস করিত। অর্থাৎ এই সকল রাষ্ট্রে একাধিক সমাজের লোক লইয়া রাষ্ট্র-সমাজ বা নেশন গঠিত হইয়াছিল।

কোন সমিতিবিশেষকেও রাষ্ট্র বলিয়া ভ্রম করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। দাস-প্রথা রহিত করিবার জন্য যে সকল সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেগুলি সমিতি মাত্র, রাষ্ট্র নয়। এমনকি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত কোন সমিতি যদি কোন দেশ নিজের অধিকারে আনে তাহা হইলেও সেরূপ সমিতি রাষ্ট্র হইবে না। যদি মাতৃভূমির সহিত সকল

সম্পর্ক ছেদন করিয়া সেই সমিতি নবজিত দেশে যাইয়া নবজিত প্রজা-দিগকে লইয়া একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলে ও স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকে, তাহাহইলেও তাহারা যে নব আখ্যা পাইবে তাহা রাষ্ট্র নয়—শাসনচক্র (বা চলিত কথায়, সরকারবাহাদুর); আর মাতৃভূমির সহিত সম্পর্ক ছেদন না করিয়াও যদি তাহারা স্বরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারীস্বরূপে এই নবজিত দেশ শাসন করিতে থাকে তাহাহইলে এই নবজিত দেশ রাষ্ট্র তো হইবেই না আর তাহারা নিজেরা শাসনচক্র ব্যতীত আর কোন নামও পাইবে না। রাষ্ট্র বৃহত্তর অর্থ-বোধক সঙ্ঘ; শাসনচক্র রাষ্ট্রের অংশবিশেষ মাত্র। রাষ্ট্র বলিতে কেবল শাসনপরিচালক বা শাসনকর্ত্তাদিগকে বুঝায় না; দেশ, প্রজা ও শাসনপরিচালক—এই তিনের সমবায়কে বুঝায়।

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্মমতবিশেষের কোন নিত্য বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না, এই বিষয় লইয়া য়ুরোপে বহুদিন ধরিয়া রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় যাজকেরা নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য এই মত প্রচার করেন যে, রাষ্ট্রনায়কের ধর্ম্মমত যাহা, তাহাই প্রজাদিগকে নীরবে মানিয়া লইতে হইবে, নহিলে রাজদ্রোহ ঘটিবে। য়ুরোপের সর্ব্বত্র খৃষ্টীয় মত গৃহীত ও প্রচারিত হইবার পর এরূপ অদ্ভুত রাজদ্রোহ অপরাধে প্রজাহত্যা করিবার অন্যায় আবশ্যকতা একরূপ লোপ পায়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে নূতন নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইতে থাকিলে য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলিতে প্রজাদের রক্তস্রোত আবার বহিতে থাকে, নূতন তত্ত্বমাত্রই রাজদ্রোহসূচক বলিয়া প্রচারিত হয় এবং পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া হয় শিরচ্ছেদ করিবার আর নয় পোড়াইয়া মারিবার রীতিমত বন্দোবস্ত হয়। ফরাসীবিপ্লবের পর হইতে এইরূপ অত্যাচারপ্রথা য়ুরোপ হইতে

উঠিয়া যায় এবং স্থির হয় যে, কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমতবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, প্রজারা স্বেচ্ছায় যে-কোন ধর্ম্মমত অবলম্বন করিতে পারিবে।

এই সঙ্গে আরও একটি ভাব যুরোপে তথা জগতে ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠে। সেটি এই—এক জাতি যাহারা, তাহারা নিজেদের জন্য পৃথক্ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে। এইজন্যই আইরিশেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ও কোরিয়াবাসীরা জাপানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে এতদূর উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এই নূতন ভাবের নামকরণ হইয়াছে—"সেল্‌ফ্ ডিটারমিনেশন্" বা আত্মবৈশিষ্ট্য। এই আত্মবৈশিষ্টনীতি মান্য করিয়া ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি পোলণ্ডবাসীদিগকে ও য়ুদীদিগকে নূতন রাষ্ট্র গড়িবার অবকাশ দিতেছেন। আত্মবৈশিষ্ট্যনীতি যে প্রত্যেক জাতিকেই স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার পক্ষে অনুকূল, তাহা না বলিলেও চলে।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আত্মবৈশিষ্ট্যনীতির সার্থকতা বুঝিলে এবং বুঝিয়া সরলভাবে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে জগতের সভ্যতা সত্যসত্যই এক পদ অগ্রসর হইবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সম্মিলনে একটি জগদ্‌রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আদৌ অসম্ভব হইবে না। পূর্ব্বে জগদ্‌রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা কয়েকবার হইয়াছে বটে; কিন্তু সে চেষ্টা আত্মবৈশিষ্ট্যনীতির অবমাননা-সূচক হওয়ায় সফল হয় নাই। সমানে-সমানে মিল হইতে পারে আর সে-মিল স্থায়ীও হয়। দুই অসমানের মিল বাধ্যতামূলক হওয়ায় ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য।

রাষ্ট্র কি কৃত্রিম ব্যবস্থা ?

রাষ্ট্র কি কৃত্রিম ব্যবস্থা ? জগতের নানা জাতির ইতিহাস জানিবার পূর্ব্বে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করিতেন যে, রাষ্ট্র কৃত্রিম ব্যবস্থাই বটে। আদিম যুগে যখন মানুষেরা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখে, তখন তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই। পরে যখন তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতা প্রবল হইয়া উঠে এবং সবলের নিকট দুর্ব্বল প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত হইতে থাকে, তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া একটি শাসনব্যবস্থা ও শাসনচক্র গঠন করে এবং ফলে রাষ্ট্রত্ব লাভ করে। সুতরাং রাষ্ট্র কৃত্রিম নয় তো কি ?

কিন্তু এ মত এখন আর চলে না। এখন নানা দেশের ও নানা জাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রাষ্ট্র কৃত্রিম ব্যবস্থা নয়, স্বভাবের নিয়মেই মানুষ ক্রমশ রাষ্ট্রত্ব লাভ করে, রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

রাষ্ট্রের বিকাশ কেমন করিয়া ঘটে অর্থাৎ সমাজ কেমন করিয়া রাষ্ট্রত্ব লাভ করে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার বিকাশের ধারা সর্ব্বত্র একরূপ হয় নাই। কোথাও পরিবারই ক্রমে গোত্র বা গোষ্ঠীতে, পরে উপজাতিতে ও শেষে জাতিতে ও রাষ্ট্র-সমাজে পরিণত হইয়াছে ; যেমন আর্য্যদের মধ্যে। আবার, কোথায় দল হইতেই ক্রমে পরিবারের সৃষ্টি ঘটে ; কিন্তু সে-পরিবারে স্ত্রীপ্রাধান্য থাকিয়া যায় এবং পুরুষ স্ত্রীদের অধীন হয়, বংশপরিচয়ও সাধারণত পিতৃনামে না হইয়া মাতৃনামে হয়। এক্ষেত্রে দল হইতে যেমন পরিবারের সৃষ্টি হয়, তেমনি বিবাহসূত্রে বিভিন্নদলের সহিত আত্মীয়তা হওয়ায় দল হইতে

বিভিন্ন দল-সমষ্টির বা উপজাতির এবং শেষে জাতির ও রাষ্ট্রসমাজের উদ্ভব ঘটে। এই দলকে স্বচ্ছন্দে গোত্র বলা যাইতে পারে। স্বগোত্রে বিবাহের নিয়ম নাই। অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, মাডাগাসকার প্রভৃতি নানা স্থানে এরূপ দলের ও জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র যদি কৃত্রিম না হয়, উহা যদি বাস্তবিকই স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলেও উহাকে জীবন-বিশিষ্ট বলা চলে কি না, সমস্যা। যাহারই বৃদ্ধি, বিকাশ, পরিণতি বা বিকার আছে তাহাই জীবনবিশিষ্ট। রাষ্ট্র যখন আপনাহইতেই বিকাশ পায়, তখন উহা জীবনবিশিষ্ট বৈ কি ? কিন্তু জীবনবিশিষ্ট হইলেই যে উহাকে জীব বলিতে হইবে এমন কোন মানে নাই। গাছ জীবনবিশিষ্ট, কিন্তু জীব নয়। গাছের তবু একটা রূপ আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন রূপ নাই, উহা অমূর্ত্ত। যাহা অমূর্ত্ত, তাহাকে জীব বলা চলেনা বলিয়াই অনেকের মত। কিন্তু অনেক পণ্ডিতে আবার রাষ্ট্রকে অমূর্ত্ত স্বীকার করিয়াও উহাকে জীব আখ্যা দেন এবং ব্যক্তি পুঞ্জকে উহার অংশ বা অঙ্গ স্বরূপ কল্পনা করেন। কারণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতা নানা ভাবে প্রকাশ পায়। সে-বিশিষ্টতা সেই রাষ্ট্র-অন্তর্গত কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, তাহাদের ঠিক সমষ্টিরও নয়। একজন পণ্ডিত রাষ্ট্রকে পুংরূপে এবং ধর্ম্মসঙ্ঘকে স্ত্রী-রূপে কল্পনাও করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরূপ কল্পনার কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

রাষ্ট্র পুরাপুরি জীব হউক আর নাই হউক, জীবনবিশিষ্ট যে, তাহাতে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনবিশিষ্ট হইলেও রাষ্ট্র অমর নয়। যখন একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে জয় করিয়া বসে, তখন দ্বিতীয় রাষ্ট্র তাহার জীবনীশক্তি হারায়। তখন আর সে-রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকে না। তবে রাষ্ট্র মরণশীল হইলেও, রাষ্ট্র-অন্তর্গত ব্যক্তিরা যদি আশা-শূন্য ও হীন-

চরিত্র না হয়, তাহাহইলে তাহারা একবার রাষ্ট্রত্ব হারাইয়া ফেলিলেও আবার সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে পারে। সকল পরাধীন জাতির আশা-ও-সান্ত্বনা-স্থল ইহাই।

দুইটি রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় মিলিয়া যায় এবং দুইটির স্থলে একটি হইয়া উঠে, তাহাহইলে উহাদের কোন একটির মৃত্যু ঘটিয়াছে এ কথা বলা ঠিক হইবে না। এরূপ স্থলে দুইএর আত্মদানে একটি নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, সেই রাষ্ট্রের মধ্যে দুইটিরই শক্তি বিরাজ করিতে থাকে, ফলে উহার জীবনীশক্তি বাড়িয়াই যায়।

দলে দলে, গোত্রে গোত্রে, উপজাতিতে উপজাতিতে মিল হইয়া যে জাতিত্বের সৃষ্টি ঘটে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। প্রথম, স্বেচ্ছাকৃত মিলনের ফলে। আর দ্বিতীয় একের সামরিক শক্তির নিকট অপরের নতিস্বীকারের ফলে।

দ্বিতীয় উপায়ে যে মিল ঘটে, সে মিল কৃত্রিম। কিন্তু কৃত্রিম হইলেও অবাধে মেলামেশা, বিবাহের আদান-প্রদান, একত্র বাস, সাহচর্য্য প্রভৃতি নানা কারণের সমবায়ে তাহাদের সে-কৃত্রিম মিল কালক্রমে স্বাভাবিক মিলনে পরিণত হয়। যতদিন না মিলন এরূপ স্বাভাবিক হইয়া উঠে, ততদিন বন্ধন-ছেদনের দিকে পরাজিত পক্ষের বেশ একটা ঝোঁক থাকে। পরাজয়ের বেদনা ভুলিতে ও ভুলাইতে পারিলেই উভয় পক্ষের মিলন সহজ হইয়া আসে।

রাষ্ট্রের বিকাশ স্বাভাবিক হইলেও, তাহাতে মানুষের কোন হাত নাই, এমন কথাও বলা চলে না। অবশ্য খুব গোড়ায় যখন উহার বিকাশ ঘটিতে থাকে, তখন তাহা লোকসকলের অজ্ঞাতসারেই ঘটিতে থাকে; কাজেই তখন মানুষের কোন হাত তাহাতে থাকে না। কিন্তু বিকাশ কতক দূর অগ্রসর হইলে মানুষ উহা ধরিয়া ফেলে এবং সাধনা দ্বারা উহার

বিকাশের পথ সহজতর করিয়া দেয়। আগে যে-কায অজ্ঞাতসারে চলিতেছিল, তখন তাহা জ্ঞাতসারে কাজেই সুষ্ঠুতর ভাবে চলিতে থাকে। এই হিসাবে রাষ্ট্র কতকটা কৃত্রিম ব্যবস্থাও বটে।

রাষ্ট্রের বিকাশে মানুষের যে হাত আছে তাহা ধরিতে পারিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রকে একেবারে কৃত্রিম বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছিলেন, রাষ্ট্র যখন কৃত্রিম, তখন উহার উৎপত্তি নিশ্চয়ই মানুষের স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিবন্ধনের ফলে ঘটিয়াছে। এই চুক্তিবন্ধনের পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা লইয়াও কত জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন, সে অবস্থা খুব সুখের, আর কেহ বলিয়াছেন তাহা খুব দুঃখের ছিল। সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, যে-কোন কারণেই হউক, যখন একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা আবশ্যক বোধ হইল, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া কোথাও এক-জনের হাতে আর কোথায়ও বা কয়েকজনের হাতে নিজেদের রক্ষার ভার সঁপিয়া দেয়। সেই একজনই সর্দ্দার, রাজা প্রভৃতি নাম পান, আর সেই কয়েক জনের সমষ্টির নাম হয় পঞ্চায়েৎ, উইটনাগেমট বা পার্লিমেণ্ট বা ঐরূপ কিছু।

রাষ্ট্রনায়কদের পদ আদৌ বংশগত হইয়াছিল, না তাঁহারা সময়ে সময়ে নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কিন্তু তাঁহাদের পদ বংশগত হউক আর নাই হউক, তাঁহারাই কালক্রমে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে থাকেন। ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে য়ুরোপের রাজারা তো এই দাবীই করিয়া বসিয়াছিলেন যে, প্রজারা একবার যখন তাহাদের রক্ষার ভার রাজাকে দিয়াছে, তখন তাহা আর ফিরাইয়া লইবার অধিকার তাহাদের নাই। এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স্ প্রজাদের সঙ্গে সারা জীবন ঝগড়া করিয়া

গেলেন এবং প্রথম চার্লস্ নিজের মাথাটি পর্য্যন্ত দিলেন। প্রজারা যুক্তি দেয়, প্রজা রক্ষা করিবার ভার লইয়াই রাজা রাজা হইয়াছেন, প্রজাদের রক্ষায় মন না দিয়া নিজের স্বার্থ বড় করিয়া দেখিতে থাকিলে রাজা আর রাজা থাকেন না, রাজপদ হইতে বঞ্চিত হন; চুক্তি কখন এক তরফা হয় না; অধিকার লইলেই দায়িত্ব মানিতে হইবে; দায়িত্বহীন অধিকার অধিকার নয়, অত্যাচার।

---

(৩)

রাষ্ট্রপ্রভু কে?—রাজা না প্রজা?

চুক্তিবাদ যখন উঠিয়া গিয়াছে তখন আর চুক্তি দিয়া রাজার অধিকার কতটুকু তাহা নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া বৃথা। চুক্তিবাদ সত্য হইলেও রাজার ক্ষমতা কখন চিরকাল অসীম হইতে পারেনা, রাজার ক্ষমতার একটা সীমা থাকিবেই থাকিবে। যাহাদের সঙ্গে চুক্তি হইয়াছিল, তাহারা যদি রাজাকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানিয়াও থাকে, তথাপি তাহাদের সেই নতিভাব মানিয়া লইতে তাহাদের সন্ততিবর্গ কখনও বাধ্য হইতে পারে না। সত্য বটে, পরিবারের কর্ত্তা তখন যাহা করিতেন, তাহা পরিবারস্থ সকলেরই করা বলিয়া গণ্য হইত; তথাপি এক কর্ত্তার পর আর এক কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব যখন আসে, তখন তিনি পূর্ব্ব কর্ত্তার সকল কায মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন কেন? পূর্ব্ব কর্ত্তা কোন্ অজুহাতে পরবর্ত্তী কর্ত্তাদের সকল স্বাধীনকর্ত্তৃত্বের সঙ্কোচ সাধন করিবেন? তিনি নিজের স্বাধীনকর্ত্তৃত্বের সঙ্কোচ সাধন করিতে পারেন বটে, সে অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু আত্মহত্যার অধিকার যেমন সভ্যসমাজ কাহাকেও দিতে চায় না, নিজেকে দাসত্বে পরিণত করিবার অধিকারও সভ্যসমাজ কাহাকেও দেয় না।

সুতরাং সভ্যসমাজের পদবীলাভ করিয়া কেহ নিজেকে রাজার হাতে একেবারে সঁপিয়া দিতে পারেনা, সন্তানদিগকে তো নয়ই। তাছাড়া, ঠিক্ কোন্ সর্ত্তে রাজার হাতে তখনকার প্রজারা নিজেদিগকে সঁপিয়া দিয়াছিল, তাহার কোন ঠিকানা নাই। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আত্মরক্ষার অধিকার যখন সকলের আছে, সে-অধিকার হইতে যখন কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেনা, তখন প্রজারা রাজার হাতে যে-আত্মসমর্পণ করিয়াছিল নিশ্চয়ই সে-আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্য ছিল—আত্মরক্ষার উপায় বিধান। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রজারা রাজার সর্ব্বময়ত্ব স্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং রাজা প্রজার স্বার্থ দেখিয়া চলিতে, প্রজার হিতসাধন করিয়া চলিতে, প্রজারক্ষার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিতে ন্যায়ত ধর্ম্মত সর্ব্বদাই বাধ্য ; নহিলে তাঁহার রাজধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে, তিনি রাজপদ হইতে ভ্রষ্ট হন। সুতরাং চুক্তিবাদ মানিলে স্বীকার করিতেই হইবে, রাজার সর্ব্বময়ত্ব ক্ষণিক ; তাহার অস্থিত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ তিনি প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালন করেন। যাঁহার সর্ব্বময়ত্ব ক্ষণিক, যিনি তাঁহার নিজের কার্য্যের জন্য অপরের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে ধর্ম্মত বাধ্য, তাঁহাকে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রভু বলা চলে কি ? তাঁহার রাষ্ট্রপ্রভুত্ব কি অপরের স্বার্থবোধের উপর নির্ভর করিতেছে না ? প্রজারা যদি মনে করে, রাজা তাহাদের স্বার্থের বিরোধী, তাহাহইলে তাহারা কি চুক্তিঅনুসারেই রাজার রাজপদ সুতরাং রাষ্ট্রপ্রভুত্ব কাড়িয়া লইতে পারেনা ?

চুক্তিবাদ ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, রাষ্ট্র স্বাভাবিক ঘটনা হইলেও, রাজার বা শাসনচক্রের কর্ত্তৃত্ব কৃত্রিম ও অনেক সময়ে আকস্মিক এবং সর্ব্বত্রই শারীর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহার প্রতিষ্ঠা একটা কৃত্রিম শক্তির উপর, তাহার অস্তিত্বের একটা চিরস্থায়ী ন্যায্য দাবী থাকিতে পারেনা। তাহার অস্তিত্ব ততদিনই

মান্য, যতদিন প্রজারা শারীর শক্তিতে ন্যূন থাকে অথবা রাজা বা শাসনচক্র প্রজাদের হিত সাধিয়াই চলেন। স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক প্রজারা যতদিন কোন রাজা রাজবংশ বা শাসনচক্রের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলে, ততদিন রাজা বা শাসনচক্র কার্য্যত সর্ব্বময় রাষ্ট্র-প্রভু বটেন। যতদিন না রুসিয়াবাসীরা জারকে ও ফরাসীরা বুর্ব্বঁদিগকে রাজপদ হইতে কার্য্যত বিচ্যুত করিয়াছিল, ততদিন জার রুস রাজ্যের এবং বুর্ব্বঁরাজারা ফরাসী রাষ্ট্রের সর্ব্বময় রাষ্ট্রপ্রভু ছিলেন। ততদিন তাঁহারা যাহা করিতেন, যাহা বলিতেন, তাহাই রাষ্ট্রবাসী-দের সকলকেই নত মস্তকে মানিয়া চলিতে হইত।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, রাজা বা শাসনচক্র সাময়িক রাষ্ট্র-প্রভু হইলেও প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রভু প্রজারাই। তবে এই রাষ্ট্রপ্রভুত্ব প্রকাশ করিবার উপায় সর্ব্বদা সমান নয় এবং অনেক সময়ে তাহা প্রকাশ করিতে হইলে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করা আবশ্যক হয়। কিন্তু বিদ্রোহী হইলেই যে প্রজারা রাজা বা শাসনচক্রকে ক্ষমতা-চ্যুত করিতে পারিবে, এমন কোন কথা নাই। বিদ্রোহে প্রজাদের পরাজয় ঘটিলে রাজা বা শাসনচক্রই তো রাষ্ট্রপ্রভু থাকিয়া যান। সুতরাং যাহারা ইচ্ছা করিলে রাজা বা শাসনচক্রের রাষ্ট্রপ্রভুত্ব কাড়িয়া লইতে পারেনা, তাহারা যে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রভু তাহাই বা কেমন করিয়া বলা চলে?

বাস্তবিক, প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রভু কে তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতণ্ডা দেখা যায়। শারীর শক্তি যদি এরূপ ক্ষেত্রে বিচারের মান দণ্ড না হয়, তবে সে অজ্ঞাত মানদণ্ডটি কি? কেহ কেহ বলেন—তাহা প্রজাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা; কিন্তু যে ইচ্ছা-অনিচ্ছার পশ্চাতে কোন বাধ্যকারী শক্তি নাই, সেই ব্যর্থ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রাষ্ট্রপ্রভুত্বের

মানদণ্ড করা চলে না। তবে শারীর শক্তি কথাটা যদি কোন কারণে কটু বোধ হয়, তাহাহইলে বরং রাষ্ট্রপ্রভুত্ব মানাইবার শক্তিকেই রাষ্ট্রপ্রভুত্বের মানদণ্ড বলা যাইতে পারে। এই মানাইবার শক্তি শারীর শক্তি হইতে আপাতত যদিই বা কিছু ভিন্ন হয়, তাহাহইলেও একেবারে ভিন্ন হইতে পারেনা। নৈতিক শক্তির বা চারিত্র্যশক্তির ভিত্তি যদি শারীর শক্তির উপর না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপ্রভুত্ব 'শূন্যের উপর গঠিত কাল্পনিক প্রাসাদ' স্বরূপই হইয়া থাকে। ফলে শারীর শক্তিই মানদণ্ড থাকিয়া যাইতেছে।

নাপলেয়ঁর রাষ্ট্রপ্রভুত্বলাভের মধ্যে চারিত্র্যশক্তি যথেষ্ট কায করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু চারিত্র্যশক্তির পশ্চাতে শারীর বল যতদিন প্রবল ও অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিনই সেই চারিত্র্যশক্তি কার্য্যকারী হইয়াছিল, ইহাও ভুলিলে চলিবে না।

জার যতদিন শারীরশক্তিতে প্রবল ছিল, ততদিন তাঁহার রাষ্ট্র-প্রভুত্ব কাড়িয়া লইতে কেহ পারে নাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি সেই শক্তি হারান, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার পতন ঘটে।

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নয় যে, রাষ্ট্রের মধ্যে শারীর-শক্তিতে যে বড়, শারীর শক্তির সহায়তায় অপর সকলকে যে তাহার রাষ্ট্রপ্রভুত্ব মানাইতে পারে, সাময়িক হইলেও সেই প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রভু।

তবে সাধারণভাবে এবং শান্তি ও সদ্ভাবের সময়ে তাঁহাকেই বা তাঁহাদিগকেই রাষ্ট্রপ্রভু বলা চলে, যাঁহার বা যাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা সকলে নত মস্তকে মানিয়া লয়। এই হিসাবে বৃটন দ্বীপের রাষ্ট্রপ্রভু—পার্লিমেণ্ট অর্থাৎ রাজা-সমেত অভিজাত-সভা ও প্রজা-প্রতিনিধি-সভা। ঐরূপ, ফরাসী দেশেরও রাষ্ট্রপ্রভু—জাতীয় সংসৎ। ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে একমাত্র রাজারাই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রভু ছিলেন এবং

তাঁহাদের ইচ্ছাই সকল কার্য্যের নিয়ামক ছিল। পাঠান ও মোগল আমলে বাদশাহেরাই অধিকাংশ ভারতের প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রভু ছিলেন।

যিনি যখন রাষ্ট্রপ্রভু থাকেন, তখন তিনি যাহা আদেশ করেন, তাহাই আইনের মর্য্যাদা লাভ করে। প্রাচীন ভারতের মত যে-দেশে আইন প্রণয়ণের ভার থাকে ব্রাহ্মণের মত কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের হাতে অথবা লোকাচারের উপর, সেদেশের রাষ্ট্রপ্রভু যে সকল ব্যবস্থা সকলকে মানাইতে চাহেন তাহাই আইন হইয়া উঠে। আইনের অস্তিত্ব ও প্রভুতা রাষ্ট্রপ্রভুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রভুর অস্তিত্ব যতদিন, ততদিন তাঁহার আইন মানিয়া চলিতে সকল প্রজাই বাধ্য, অন্যায় হইলেও বাধ্য।

প্রজারা সকলে আইনের অধীন, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রভু আইনের অধীন কি না? আইন যাঁহাহইতে উদ্ভূত, আইন মানা-না-মানা তাঁহারই ইচ্ছাধীন হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তিনি যদি নিজেকে আইনের অধীন করিতে চান তবেই তিনি আইনের অধীন, নহিলে নহেন।

আইন আর নৈতিকবিধান এক নয়, তাহা যেন আমরা মনে রাখি। নৈতিকবিধান মানিতে রাজা প্রজা সকলেই বাধ্য; কিন্তু আইন মানিয়া চলিতে রাজা বাধ্য নাও হইতে পারেন।

ইহাও যেন আমাদের মনে থাকে, কোন্‌টি নৈতিকবিধান আর কোন্‌টি নয় তাহা স্থির করিবার কোন বাঁধাধরা উপায় নাই। সুতরাং যাহা তোমার নিকট নৈতিকবিধান তাহা আমার নিকট নৈতিক-বিধান না হইতেও পারে। কাজেই কাহাকেও নৈতিকবিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য করা চলেনা। রাজা যদি প্রজাকে কোন নৈতিকবিধান মানাইতে চান, তাহাহইলে আর তাহা নৈতিকবিধান থাকে না, তাহা আইন হইয়া যায়।

রাষ্ট্রপ্রভুর ইচ্ছাই যখন আইন, তখন রাষ্ট্রপ্রভুর বিরুদ্ধে কোন প্রজার কোন অধিকার থাকিতে পারে কি না ? মানুষের যে সকল স্বাভাবিক অধিকার সভ্যসমাজ মানিয়া লইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধানতম হইতেছে—আত্মরক্ষার অধিকার। কিন্তু এই অধিকারও প্রজারা রাষ্ট্রপ্রভুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা জারী করিতে পারেনা। পারিলে, সমাজহিতের জন্যও, রাষ্ট্রবাসীদের মঙ্গলের জন্যও, রাষ্ট্রপ্রভু নরঘাতককে ও রাজদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারিতেন না ; ফলে রাষ্ট্রবাসীদের পক্ষে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিত।

প্রজাদের যাহা-কিছু অধিকার আছে, তাহার মূল রাষ্ট্রপ্রভু। রাষ্ট্রপ্রভু প্রজাদের সে-সব অধিকার যে মান্য করেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া। তিনি প্রজাদের যে-সব অধিকার দেন, সে-সব অধিকার আইনের ভিতর আসিয়া পড়ে, সুতরাং সেই সকল অধিকারের অমর্য্যাদা করিবার অধিকার কাহারও নাই। অধিকারগুলি স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া নয়, আইন বলিয়াই প্রজারা পরস্পরের অধিকারগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়।

প্রজাদের যে স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব, তাহাও রাষ্ট্রপ্রভুর দান। সেই দানের বলেই প্রজারা কোন কোন বিষয়ে স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। সেই রাষ্ট্রের প্রজারাই স্বাধীন, যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রভু প্রজাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কোন একটী বা একাধিক বিষয়ে স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন। ইংরেজ প্রজারা নিজেদিগকে ততদিনই স্বাধীন বলিয়া মনে করে, যতদিন তাহারা তাহাদের দেয় করের আদায় ও খরচা সম্বন্ধে মতামত ঘোষণা করিতে পারে ; প্রাচীন ভারতবাসীরা ততদিনই নিজেদিগকে স্বাধীন মনে করিত, যতদিন রাষ্ট্রপ্রভু তাহাদের ধর্ম্মমতে ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-ব্যাপারে হাত দিতেন না।

এই অধ্যায়ের শেষে কেবল আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আজকাল যেরূপ ভাবস্রোত চলিয়াছে, তাহাতে প্রজারাই ক্রমশ প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রভু হইয়া উঠিতেছে; কারণ শাসনচক্র আর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন ব্যবস্থার প্রণয়ন ও প্রচলন করিতে সাহস পাইতেছেন না; তাঁহারা বুঝিতেছেন, কেবল নৈতিক শক্তিতে নয় শারীরশক্তিতেও প্রজারা ক্রমশ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে সুতরাং তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করা আর নিজেদের ধ্বংস টানিয়া আনা একই কথা। কিন্তু এখানেও দ্রষ্টব্য যে, শরীর শক্তিই রাষ্ট্রপ্রভুত্বের নিয়ামক। এখনও সেদিন আসে নাই যেদিন প্রজাদের ভয়ের উপর নয়, কেবল শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপর শাসনচক্রের ভিত্তি হইবে।

---

(৪)
আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধান।

কোন রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেনা। যদি আর-কোন কারণও না থাকে তাহাহইলেও বাণিজ্য ব্যপদেশে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রজাদের যাতায়াত ও ভাবের আদান প্রদান অবশ্যম্ভাবী। এরূপ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে স্বার্থ-সংঘর্ষ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। এইরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বে যুদ্ধ বাধিত এবং যুদ্ধের ফলে যাহা-হউক একটা কিছু স্থির হইত। কিন্তু অধুনা পারতপক্ষে কেহ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় না। নিতান্ত আত্ম সম্মানে আঘাত না পড়িলে অথবা স্বার্থে একান্ত অন্ধ না হইলে সকলেই বিবাদটা বিনা যুদ্ধেই মিটাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। ইতিহাসে এরূপ চেষ্টার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

বিনা যুদ্ধে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতানুসারে কতকগুলি সাধারণ কার্য্যবিধি প্রণীত ও প্রচারিত হয়। তাহাই আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধান নামে পরিচিত। স্থির হয়, ছোট-বড় প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই বিধানের চক্ষে সমান বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর কোন বিধান চালাইতে পারিবে না। যে যাহার নিজের আইন নিজে করিবে এবং সেই আইন কেবল স্বরাষ্ট্রেই কার্য্যকারী হইবে। তারপর তটবর্ত্তী সমুদ্রে কাহার কতটুকু অধিকার থাকিবে, রাজ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন্ কোন্ পন্থা নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইবে, পররাষ্ট্রে অবস্থিত নিজ প্রজাদের নিরাপত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যুদ্ধকালে কিরূপ যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিতে হইবে, যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলির সহিত নিরপেক্ষ বা উদাসীন রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইবে, ইত্যাদি নানা বিষয়ই এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আইনের যে বাধ্যকারী শক্তি আছে, এই সকল বিধানের সেরূপ কোন শক্তি নাই। এই সব বিধান মানিয়া চলা-না-চলা রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সম্প্রতি ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে, তাহাতে প্রথমে জর্ম্মন পক্ষ পরে মিত্রপক্ষ এই সকল বিধানের প্রতি অমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন। যখন কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ করিতে ক্ষেপিয়া উঠে আর অপরকে যখন তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে হয়, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট বিধান মানিয়া চলা কোন পক্ষের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধান শান্তির সময়েই কার্য্যকারী হইতে পারে, যুদ্ধের সময়ে নয়।

অবশ্য 'রাষ্ট্রসংহতি' গঠন করিয়া মিত্রশক্তি এক্ষণে রাষ্ট্রসকলের ভবিষ্যৎ যুদ্ধস্পৃহা দমিত রাখিবার উপায় সন্ধান করিতেছেন; কিন্তু

আত্মসম্মানবোধ ও স্বার্থবোধ—এই দুইটিকে জগৎ হইতে লুপ্ত করিতে না পারিলে যুদ্ধকে ঠেকাইয়া রাখা বিধাতারও সাধ্য নাই। রাষ্ট্রসংহতি যদি জাতিমাত্রকেই রাষ্ট্রলাভচেষ্টার উদ্যোগমাত্রই রাষ্ট্র গঠন করিবার অবকাশ দিতে পারে এবং কখনও কাহারও আত্মসম্মানে কোনরূপ আঘাত না দিয়া সকল বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে পারে তাহাহইলে উহার পক্ষে সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইতে পারে, অন্যথা একেবারেই নয়।

তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। রাষ্ট্রসংহতির আদেশ বা মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে রাষ্ট্রগুলি বাধ্য থাকিবে কি না? যদি রাষ্ট্রগুলিকে সে বাধ্যতা মানিতে হয়, তাহাহইলে রাষ্ট্রগুলি তো রাষ্ট্রত্ব হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রের প্রধানতম লক্ষণ স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিতে হইলে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থাকে না, তাহা বাধ্যকারী রাষ্ট্র বা শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। সুতরাং রাষ্ট্রগুলিকে নিজের আদেশ বা মীমাংসা মানাইতে পারিলে রাষ্ট্রসংহতি একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের নায়ক হইয়া উঠিবে এবং লুপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমবায়ে সেই বৃহত্তর রাষ্ট্রের সৃষ্টি ঘটিবে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র কি এইরূপে তাহার রাষ্ট্রত্ব হারাইতে সম্মত হইবে?

রাষ্ট্রসংহতির গঠনে রাষ্ট্রগুলির যে এইরূপ একটি আশঙ্কার কারণ আছে, তাহা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দ্বিধা দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে। ছোটছোট ও ক্ষীণবীর্য্য রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসংহতির সভ্য হইবার জন্য ঔৎসুক্য দেখাইতেছে বটে; কিন্তু সে যেন বৃহত্তর বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়-স্বরূপে।

রাষ্ট্রসংহতি যদি টেঁকিয়া যায় এবং নিজের আদেশ ও মীমাংসাগুলি সকলকে জোর করিয়া মানাইতে সমর্থ হয়, তাহাহইলে আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধান বাস্তবিক পক্ষেই আইনের মর্য্যাদা লাভ করিবে এবং এই

আন্তর্রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রভু হইবে—রাষ্ট্রসংহতি, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি নয়। অথবা রাষ্ট্রসংহতির নামে যে রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা চালাইতে থাকিবে সেই রাষ্ট্রই আন্তর্রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপ্রভু হইয়া উঠিবে।

রাষ্ট্রসংহতি যদি এইরূপ ভাবে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের গঠন করিতে পারে, যে-রাষ্ট্র সারা পৃথিবীব্যাপী হইবে, তাহাহইলে মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে যে-বিরোধ তাহা বহু পরিমাণেই লোপ পাইবার সম্ভাবনা। তখন হয়ত তথাকথিত বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় একইরূপ চিন্তার ধারা ও একইরূপ আদর্শ সকলের মধ্যে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিবে এবং মানুষ তখন প্রকৃত পক্ষেই স্বাদেশিকতার উর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্বমানব হইতে পারিবে।

রাষ্ট্রসংহতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। তাহা—আন্তর্রাষ্ট্রীয় শ্রমী-সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘ যদি স্থায়িত্বলাভ করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রসংহতির কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিবে। আজকালকার রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমীরাই ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। কালে যখন তাহারা স্ব স্ব রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবে, তখন শাসনচক্রগুলি তাহাদেরই নিদেশ মত চলিতে বাধ্য হইবে, ফলে ধনীর সহিত নির্ধনের, রাজার সহিত প্রজার যে-বিরোধ তাহা লোপ পাইবে। তখন বাস্তবিকই সাম্যভাব রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ফুটিয়া উঠিবে। কাজেই মানুষের পক্ষে স্বাদেশিকতার উর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্বমানব হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত হইবে না।

তবে শীঘ্র যে এরূপ একটা কাণ্ড ঘটিবে এরূপ আশা সঙ্গত নয়। সময়ে সময়ে ঘটনাগুলি খুব দ্রুতগতিতে ঘটে বটে, কিন্তু সব সময়ে নয়। ফরাসীবিপ্লবের নেতারা আশা করিয়াছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহারা পৃথিবীতে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে পারিবেন। কিন্তু

তারপর একশত বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে; এত দীর্ঘ কালেও জগৎ ঐদিকে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে? এক পাদও বুঝি নয়।

রাষ্ট্রসংহতি সম্পর্কে কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, বৃহত্তর রাষ্ট্রের যে-কল্পনা করিতেছ তাহা ঠিক নয়; রাষ্ট্রসংহতি কাহাকেও আদেশ করিবেন না, কেবল বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবেন এবং সেই মীমাংসা মানা-না-মানা রাষ্ট্রগুলির স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। "কয়েকজন প্রধান বিধানবেত্তা যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহা মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না; কারণ, সে-মীমাংসা সঙ্গত হওয়ার সম্ভাবনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সভ্য বলিয়া পরিচয় দিব, স্বরাষ্ট্রের আইনগুলির বাধ্যকারী শক্তি মানিব, অথচ এইরূপ সঙ্গত মীমাংসার প্রতি ঘোর অবজ্ঞা দেখাইব, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে।" ভাষ্যকার কেণ্টের এই যুক্তি দিয়া কেহ কেহ রাষ্ট্রসংহতির বিধানগুলির মধ্যে কেবল বাধ্যকারীনৈতিকশক্তির বিকাশ দেখিতে পারেন; কিন্তু সংহতির বিধানগুলি যদি নৈতিকবিধান মাত্র হয়, উহাদের পশ্চাতে যদি শারীরশক্তি লুকান না থাকে, তাহাহইলে রাষ্ট্রসংহতি আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধানের ইতিহাসে বিশেষ কিছু নূতনত্ব আনিতে পারিয়াছে এরূপ কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারেনা।

---

(৫)

রাষ্ট্রের শ্রেণীভেদ।

রাষ্ট্রমাত্রের লক্ষণ একরূপ হইলেও উহারা সর্ব্বথা একরূপ নহে। এক তো বিস্তৃতিগত ভেদ আছে। কোন রাষ্ট্র একটি নগরকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রীকরাষ্ট্রগুলি সাধারণত এইরূপই ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পত্তনও এইরূপ নগররাষ্ট্রে হইয়াছিল। কোন রাষ্ট্র

দেশব্যাপী; যেমন চীন, পারস্য। কোন রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন দেশব্যাপী; যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্য।

রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিদের জাতিগত ভেদে কোন রাষ্ট্র জাত্যৈক (এক জাতির দ্বারা অধ্যুষিত) রাষ্ট্র আর কোন রাষ্ট্র বা বহুজাতির লোককে লইয়া গঠিত। প্রথমটির দৃষ্টান্ত ফ্রান্স, দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত সুইজর্লণ্ড।

শাসনকেন্দ্রভেদে কোন রাষ্ট্র এক-রাষ্ট্র (যেমন ইটালী, ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেন) আর কোন রাষ্ট্র অখণ্ডসম্মিলিতরাষ্ট্র (যেমন মার্কিন রাষ্ট্র) আর কোনটি সোপনিবেশ-রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য (যেমন বৃটিশ-সাম্রাজ্য)।

শাসকদিগের সংখ্যাভেদেও কোন রাষ্ট্র একেশ্বরতন্ত্রমূলক। কোন রাষ্ট্র বিশিষ্টপ্রজাতন্ত্রমূলক আর কোন রাষ্ট্র বা সাধারণ প্রজাতন্ত্রমূলক। প্রথমটির দৃষ্টান্ত আবিসিনিয়া, দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলি ও তৃতীয়টির দৃষ্টান্ত ফ্রান্স।

শাসকদিগের উদ্দেশ্যভেদেও রাষ্ট্রের শ্রেণীভেদ ঘটে। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু আরিষ্টটল্ বলেন—শাসনচক্র যখন রাষ্ট্রের হিত লক্ষ্য করিয়াই শাসনকার্য্য পরিচালন করেন, তখন শাসক একজন হইলে রাষ্ট্র রাজতন্ত্রমূলক, কয়েকজন হইলে অভিজাততন্ত্রমূলক এবং রাষ্ট্রপ্রজারা সকলে মিলিয়া হইলে গণতন্ত্রমূলক হয়; এবং শাসনচক্র রাষ্ট্রের হিত ভুলিয়া আপনাদের হিত বা স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে রাষ্ট্র যথাক্রমে কুরাজতন্ত্রমূলক, বিশিষ্টকুপ্রজাতন্ত্রমূলক ও ইতরজনতন্ত্রমূলক হয়।

আরিষ্টটলের শ্রেণী-বিভাগ-ব্যাখ্যাকালে কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে বেশ একটা পারম্পর্য্য আছে। যথা, আগে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র থাকে; কিন্তু রাজারা কালক্রমে আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়া রাজধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলে রাজতন্ত্র কুরাজতন্ত্রে পরিণত হয়। কুরাজাদের অত্যাচারে প্রজারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলে

প্রজাদের অভিভাবকস্বরূপে রাষ্ট্রের অভিজাতব্যক্তিরা কুরাজাকে পদচ্যুত করিয়া নিজেরা শাসনভার গ্রহণ করেন। যতদিন তাঁহারা আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, ততদিন রাষ্ট্র অভিজাততন্ত্র; কিন্তু যেই তাঁহারা আদর্শ হারাইয়া নিজেদের স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং রাষ্ট্রের হিতসাধনে অবহেলা করিতে থাকেন, অমনি তাঁহাদের শাসন বিশিষ্টতন্ত্র থাকে বটে তবে বিশিষ্টকুপ্রজাতন্ত্র হইয়া উঠে। তখন আবার প্রজারা তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়া নিজেরাই শাসনকার্য্য চালাইতে থাকে; যতদিন শাসন কার্য্যের আদর্শ ঠিক থাকে ততদিনকার শাসন গণতন্ত্রমূলক; কিন্তু যাই আদর্শ মলিন হইয়া যায় এবং ভাববিশেষের আতিশয্যে জন-সাধারণ ধনীদের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, অমনি তাহাদের শাসন ইতরজনতন্ত্রমূলক হইয়া পড়ে। তখন দেশে অরাজকতা বা 'মাৎস্য-ন্যায়' প্রবল হইয়া উঠে। সেই অবসরে কোন একজন প্রবল যুদ্ধনিপুণ রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তি অপর সকলকে বশীভূত করিয়া অরাজকতা দূর করেন এবং নিজেকেও রাজগৌরবে মণ্ডিত করেন। তারপর আবার যথাক্রমে রাজতন্ত্রের পর কুরাজতন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শাসনব্যবস্থার আবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। এই আবর্ত্তন-ক্রিয়াই 'আরিষ্টটলীয় চক্র' নামে বিখ্যাত।

এই চক্র যে প্রতিনিয়ত যথানিয়মে ঘুরিতেছেই, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলেনা। গ্রীকনগররাষ্ট্রগুলিতে কিন্তু ঠিক এইরূপই ঘটিত। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ফ্রান্সে এই চক্রের একটিমাত্র আবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল বলা যাইতে পারে, কিন্তু চাকা একবার ঘুরিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। বুর্ব্বঁ রাজারা প্রথমে বাস্তবিকই রাজার মত রাজা ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে বিশেষত পঞ্চদশ লুইএর আমল হইতে কুরাজায় পরিণত হন। ষোড়শ লুই নিজে যত ভাল মানুষই হউন না, তাঁহার রাজ্যকাল কুরাজতন্ত্রমূলকই

ছিল। এই কুরাজতন্ত্রমূলক অপশাসনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কয়েকজন শিক্ষিতসাধারণ উদ্যোগ করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন এবং কার্য্যত বিশিষ্টপ্রজাতন্ত্র শাসনব্যবস্থারও প্রতিষ্ঠা করেন। জাকব্যাঁ সম্প্রদায়ভুক্ত চরমপন্থীদের প্ররোচনায় ও নেতৃত্বে বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রব্যবস্থা বিশিষ্ট-কুপ্রজাতন্ত্রব্যবস্থায় পরিণত হয়। তারপর, সর্ব্বসাধারণে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাওয়ায় কিছুদিনের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু শীঘ্রই তাহা ইতরজনতন্ত্রে পরিণত হইলে সমরকুশল অসামান্য বুদ্ধিশালী নাপলেঁয় বুনাপার্ৎ সিংহাসনে আরোহন করেন। চক্র এই পর্য্যন্ত ঠিকই ঘুরিয়াছিল, তারপর থামিয়া যায়। কারণ, তারপর আর আবর্ত্তনের পারম্পর্য্য থাকেনা।

না থাকিবারই কথা। এখনকার রাষ্ট্রগুলি ঠিক্ যেরূপভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আরিষ্টটলের শ্রেণীভেদ কোন কাযে আসে না। এখন এমন রাষ্ট্র পাওয়া দুর্ঘট যে-রাষ্ট্রের শাসনচক্র হয় কেবল একজনকে লইয়া বা কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট প্রজাকে লইয়া আর নয় সমস্ত প্রজাকে লইয়া গঠিত। এখনকার রাষ্ট্রগুলি হয় একেশ্বরতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মিশ্রণমূলক, আর নয় একেশ্বরতন্ত্র অভিজাততন্ত্র ও জনতন্ত্রের মিশ্রণমূলক আর নয় বিশিষ্টপ্রজাতন্ত্র ও জনতন্ত্রের মিশ্রণমূলক। প্রথমটির দৃষ্টান্ত আফগানিস্থান, নেপাল, ভুটান, প্রাচীন রাজপুতনার রাজ্যগুলি, শিবাজি প্রতিষ্ঠিত মরাঠা-রাজ্য ; দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি ; তৃতীয়টির দৃষ্টান্ত—সুইজর্লণ্ড। উপর-উপর দেখিয়া আরিষ্টটলের শ্রেণী ভেদ চালাইতে গেলে আমাদিগকে পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। বৃটিশ রাষ্ট্রও একেশ্বরতন্ত্র আবার আবিসিনিয়াও একেশ্বরতন্ত্র, কিন্তু উভয় রাষ্ট্রে আকাশ-পাতাল তফাৎ। বৃটিশ রাষ্ট্রকে যদি একেশ্বর-তন্ত্র না বলিয়া জনতন্ত্র বলা হয়, তাহাহইলে মার্কিন রাষ্ট্রের কিম্বা ফরাসী

রাষ্ট্রের সহিত উহা এক পর্য্যায় ভুক্ত হইয়া পড়ে ; অথচ ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

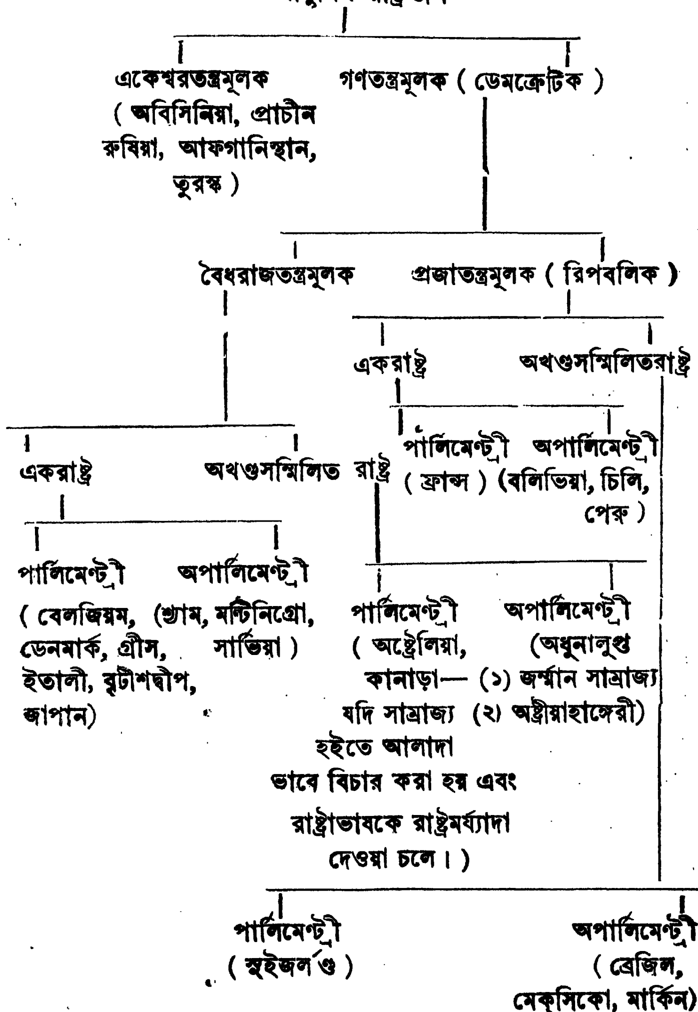
আরিষ্টটলের শ্রেণীভেদ এখনকার রাষ্ট্রসমূহের উপযোগী নয় বুঝিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা নূতন নূতন শ্রেণীভেদের চেষ্টা করিয়াছেন। মঁৎকিয়ে বলেন—রাষ্ট্র তিন প্রকার, যথা (১) (বিশিষ্টই হউক আর সাধারণই হউক) জনতন্ত্রমূলক (২) বৈধরাজতন্ত্রমূলক ও (৩) অবাধপ্রভুতন্ত্রমূলক। তাঁহার এইরূপ বিভাগ যে নির্দ্দোষ নহে, তাহা বৃটিশ-রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত লইলেই হইবে। উহা একদিকে যেমন জনতন্ত্রমূলক, অন্যদিকে তেমনি বৈধরাজতন্ত্রমূলক।

ভনমল বলেন, রাষ্ট্র ছয় প্রকার, যথা—(১) গৃহকর্ত্তৃতন্ত্রমূলক (এরূপ রাষ্ট্রের শাসনচক্র প্রজাদের পিতা বা অভিভাবক স্বরূপ) ; (২) যাজক-তন্ত্রমূলক (ব্লুণ্টশ্লি বলেন—যাজক-তন্ত্র দ্বিবিধ ; যখন যাজকেরা ভগবানকে বা কোন দেবতাকে বা কোন ভাববিশেষকে রাজার আসনে বসাইয়া দেব-দাস স্বরূপে রাষ্ট্রের সুশাসন করিতে থাকেন, তখন রাষ্ট্র দেব-তন্ত্রমূলক ; আর যখন তাঁহারা নিজেরাই আদর্শ হারাইয়া কর্ত্তা হইয়া বসেন-তখন কুযাজকতন্ত্রমূলক) ; (৩) অবাধপ্রভুতন্ত্রমূলক (৪) ক্লসিক (? নির্দ্দোষ-জনতন্ত্রমূলক) (৫) সামন্ততন্ত্রমূলক ও (৬) বৈধরাজতন্ত্রমূলক। এইরূপ বিভাগও যে নির্দ্দোষ নহে, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তুরস্কের মত যাজকতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রও তো অবাধপ্রভুতন্ত্রমূলক। বৈধরাজতন্ত্রমূলক বা সামন্ততন্ত্রমূলক রাষ্ট্র যে গৃহকর্ত্তৃতন্ত্রমূলক হইতে পারেনা, তাহা কে বলিল ?

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির শাসনচক্রের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া অধ্যাপক লেকক রাষ্ট্রগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিতে চান, যথা—একেশ্বরতন্ত্রমূলক ও গণতন্ত্রমূলক। প্রথমোক্ত রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রপ্রভু

একজন মাত্র ; আর শেষোক্ত রাষ্ট্রগুলির শাসনচক্র অধিকাংশ প্রজার বা প্রজাপ্রতিনিধির মতানুসারে পরিচালিত হন। যুদ্ধের পূর্ব্বকার রুসিয়া ও আবিসিনিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং ফ্রান্স, মার্কিন ও বৃটিশদ্বীপ শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্র। লেককের শ্রেণীভেদ এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রগুলিকে (১) বৈধরাজতন্ত্রমূলক ও (২) প্রজাতন্ত্রমূলক এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটিকে আবার এক-রাষ্ট্র ও অখণ্ডসম্মিলিতরাষ্ট্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। তারপর তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই সকল রাষ্ট্রের কতকগুলিতে পার্লিমেণ্ট্রী প্রথা আছে আর কতকগুলিতে নাই। যে যে রাষ্ট্রে পার্লিমেণ্ট্রী-প্রথা আছে, সে সকল রাষ্ট্রের শাসনচক্র পার্লিমেণ্টের নিকট বা প্রজাপ্রতিনিধিদের নিকট নিজেদের কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকেন। কারণ, তাঁহারা পার্লিমেণ্টকর্ত্তৃকই নিয়োজিত ; দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের নাম করা যাইতে পারে। ফ্রান্স ও পার্লিমেণ্ট্রী প্রথাকে কাবিনেট বা মন্ত্রিসভাগত প্রথাও বলে, আবার দায়িত্বসূচক প্রথাও বলে। অপার্লিমেণ্ট্রী প্রথা সেই রাষ্ট্রে দেখা যায়, যে-রাষ্ট্রে মন্ত্রিসমাজ পার্লিমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয় না এবং পার্লিমেণ্টের কাছে কোন কাযের জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেনা। তাহারা রাষ্ট্রনায়কের কর্ম্মচারি মাত্র। সেইজন্য অপার্লিমেণ্ট্রী প্রথাকে রাষ্ট্রনায়কী প্রথাও বলে, আবার দায়িত্বহীন প্রথাও বলে। এইরূপ রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত মার্কিন ও অধুনালুপ্ত জর্ম্মন সাম্রাজ্য।

লেককের শ্রেণীভেদটা কাজেই এইরূপ দাঁড়াইতেছে :—



লেককের এই বিভাগ যে সঙ্গত ও নির্দ্দোষ তাহা না বলিলেও চলে। বৃটিশ ভারত রাষ্ট্র নয় কাজেই কোন শ্রেণীতেই পড়ে না। অষ্ট্রেলিয়া এবং কানাডাকেও রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা যায় না।

রাষ্ট্রনায়ক কোন রাষ্ট্রে প্রজাদিগকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত আর কোন রাষ্ট্রে বংশানুক্রমিক প্রথায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই হিসাবেও গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রগুলির শ্রেণীভেদ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ শ্রেণীভেদের কোন মূল্য নাই; যেহেতু বংশানুক্রমিক প্রথা বর্ত্তমান থাকা সত্বেও গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের প্রজারা সাধারণত রাষ্ট্রনায়ককে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে। তাছাড়া বংশানুক্রমিক প্রথার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে এবং রাষ্ট্রপ্রজাদের মধ্য হইতেই রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচনের ঝোঁক যেন সর্ব্বত্রই প্রবণতা লাভ করিতেছে। অধ্যাপক রেমণ্ড গার্ফিল্ড গেটেলের ভাষায় বলিতে পারা যায়—"গত শতাব্দীতে যে সকল রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে, সে সকল রাষ্ট্রে বংশানুক্রমিকভাবে রাষ্ট্র-নায়ক নিয়োজনের প্রথা চালাইবার চেষ্টা হয় নাই। আর যে সকল রাষ্ট্রে সামন্তপ্রথার শেষচিহ্নস্বরূপ ঐ প্রথা আছে, সে সকল রাষ্ট্রের প্রজারাও ঐ প্রথার প্রতি দিনদিনই অধিকতর মাত্রায় বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। সারা য়ুরোপেই দেখা যায় যে, বংশানুক্রমিক রাজারা প্রজাদের নির্ব্বাচিত পার্লিমেণ্টের নিয়োজিত মন্ত্রিসমাজের হাতে শাসনক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং বংশানুক্রমিক অভিজাতসভাও প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার নিকট নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। ভবিষ্যতে রাজকর্ম্মচারিরা প্রজাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন, না তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন, না পরীক্ষার ফলানুসারে নিযুক্ত হইবেন, না অন্য কোনরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহা আজ জোর করিয়া বলা চলে না বটে; তবে ইহা স্থির যে, কেবল বংশ বিশেষে

জন্মেরখাতিরে রাষ্ট্রনায়কত্ব লাভের ও রাজকর্ম্মচারিত্ব লাভের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবেই।

একরাষ্ট্র ও সম্মিলিতরাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, উপনিবেশ স্থাপনের ঝোঁকের ফলে এবং প্রজাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনস্পৃহা জাগিয়া উঠার ফলে একরাষ্ট্রগুলি ক্রমশ বহুকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য একাধিক অধীনশাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দিকে যাইতেছে আর পক্ষান্তরে সম্মিলিতরাষ্ট্রও স্বার্থগত একতাবৃদ্ধির জন্য, পর-রাষ্ট্রের সহিত একযোগে কায করিবার আবশ্যকতাবোধেরবৃদ্ধির জন্য এবং সারারাষ্ট্রে একই প্রকার আইনের ঔচিত্যবোধের বৃদ্ধির জন্য ক্রমশ এক রাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং সম্মিলিতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রকগুলি প্রদেশ মাত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে।

পার্লিমেণ্ট্রী ও অপার্লিমেণ্ট্রী প্রথা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যেসকল রাষ্ট্রে পার্লিমেণ্ট্রী প্রথা আছে, সে সকল রাষ্ট্রের মন্ত্রিসমাজ ক্রমশ অধিকতর স্বাধীনতা লাভের প্রবণতা দেখাইতেছেন, আর যে সকল রাষ্ট্রে পার্লিমেণ্ট্রী প্রথা নাই, সেই সকল রাষ্ট্রে কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্যনীতি এই উভয়ের সামঞ্জস্য রাখায় আবশ্যকতাবোধ ক্রমশই যেমন বাড়িতেছে ফলে পার্লিমেণ্টের সহিত মন্ত্রিসমাজেরও যোগ রক্ষার চেষ্টাও তেমনি বাড়িতেছে।

ভবিষ্যতে শাসনচক্র কিরূপ ভাবের হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা অবশ্য তিনি বলিতে পারেন না, তবে তাঁহার ধারণা যে, একরাষ্ট্রের ও সম্মিলিত-রাষ্ট্রের কতকগুলি লক্ষণ লইয়া এবং পার্লিমেণ্ট্রী ও অ-পার্লিমেণ্ট্রী প্রথার কতকগুলি লক্ষণ লইয়া নির্ব্বাচনমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকেই সকল রাষ্ট্রের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি বলেন, মার্কিন যেমন সম্মিলিতরাষ্ট্রের লক্ষণ অনুসারে সম্মিলিত সাম্রাজ্য

গড়িতেছে, ইংলণ্ডও তেমনি উপনিবেশগুলিকে লইয়া 'ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন' বা সম্মিলিত সাম্রাজ্য গড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; আবার, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসমাজ যেমন পার্লিমেণ্টের অধীনতা কাটাইয়া উঠিতেছেন ও অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের বশ্যতা দেখাইতেছেন, মার্কিনও তেমনি স্পিকার (সভানায়ক) ও ষ্টিয়ারিং কমিটিকে (পরিচালন সমিতিকে) প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসমাজরূপে গড়িয়া তুলিতেছে।

গেটেল ইহাও বলেন যে, বিভিন্নরাষ্ট্রের গঠন-পার্থক্য যতই থাকুক না, প্রজাদের সহিত সম্পর্ক লইয়া ও রাষ্ট্রের কার্য্যপদ্ধতি লইয়া সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বিস্ময়কর একতা দেখা যায়। রাষ্ট্রমাত্রেরই কেন্দ্রস্থল শাসনচক্র, শাসনচক্রই রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিমাপক; শাসনচক্রই রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করেন। আধুনিক সকল রাষ্ট্রেই প্রজারা প্রায় সমানভাবেই স্বাধীনতা বা স্বাধীনকর্তৃত্ব ভোগ করে এবং শাসনচক্রগুলিই রাষ্ট্রহিত লক্ষ্য করিয়া প্রায় একইরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। শাসনচক্রের গঠনে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহার মূল কতকটা স্থানীয় বিশিষ্টতা, কতকটা লোকসকলের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা আর কতকটা অপর যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাগত বিশিষ্টতা। শাসনচক্রের গঠনগত এই পার্থক্য কিন্তু অধুনা কোন রাষ্ট্রেই প্রজাদের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ে কোনরূপ বিশিষ্টতা দেখায় না। সকল রাষ্ট্রেই প্রজাদের অবস্থা প্রায় সমরূপ।

---

(৬)
রাষ্ট্রের মৌলিকবিধান।

রাষ্ট্রগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ যদিও স্বভাবতই ঘটিয়াছে, তথাপি শাসনচক্রের সহিত প্রজাদের বারম্বার সংঘর্ষের ফলে প্রজারা শাসন-

চক্রের নিকট এমন কতকগুলি অধিকার আদায় করিয়া লয় যাহা মানিয়া চলিতে শাসনচক্র একান্তপক্ষে বাধ্য। যে সকল রাষ্ট্রে অবাধপ্রভুতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে সকল রাষ্ট্রে প্রজাদের যে ঐরূপ কোন অধিকার নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, প্রজাদের ঐরূপ কোন অধিকার থাকিলে শাসনচক্রের প্রভুত্ব অবাধ ও অসীম হইতে পারেনা।

প্রজাদের এই-যে বিশিষ্ট অধিকার, ইহাকে ইংরেজীতে বলে কনষ্টিট্যুশনেল ল। বাঙ্গালায় আমরা উহার নাম দিব—রাষ্ট্রের মৌলিক বিধান। 'আইন' না বলিয়া 'বিধান' বলিতেছি এইজন্য যে, আইনের অস্তিত্ব ও প্রভুত্ব শাসনচক্রের ইচ্ছাধীন; কিন্তু এই বিধানের অস্তিত্ব ও প্রভুত্ব অনেক সময় শাসনচক্রের ইচ্ছার উপর তো নির্ভর করেই না, বরং ইহাই শাসনচক্রের নিয়ামক। সুতরাং ইহা 'আইন' অপেক্ষাও এক হিসাবে উচ্চ জিনিষ। কাজেই ইহার 'বিধান' নামই ঠিক। কিন্তু একথাও ঠিক যে,শাসনচক্র ইহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করে বলিয়াই ইহা মান্য; সেই হিসাবে ইহা আইনও বটে, উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কেবল প্রণয়ন-ও-পরিবর্ত্তন-পদ্ধতিগত ও বিচারগত। ইংলণ্ড ও ইতালীতে আবার প্রণয়ন-ও-পরিবর্ত্তনগত পার্থক্যও নাই।

প্রজাদের কতগুলি বিশিষ্ট অধিকারকে'রাষ্ট্রের মৌলিকবিধান' বলা হয় বটে, কিন্তু সে সব অধিকার কিরূপ? তাহাদের লক্ষণ কি? লক্ষণ যে কি তাহা লইয়া পণ্ডিতদের কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত ভেদের কারণ এই-যে সব রাষ্ট্রের মৌলিকবিধানগুলি সমান নয়। তবে এই মৌলিকবিধানগুলির মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এক জায়গায় উহাদের সকলের মিল আছে এবং সেইটিই উহাদের প্রধান বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব ধরিয়াই বিচার করিতে হয়—কিরূপ অধিকারকে আইন বা বিধান বলিব। বিশেষত্বটি এই—অধিকারটি রাজা-

প্রজার (শাসনচক্র ও প্রজার) ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও এলাকা নির্ণায়ক হইবে। রাজা বা শাসনচক্রের অধিকার কতটুকু, প্রজার কতটা স্বাধীনতা তাঁহারা হরণ করিতে পারেন, শাসনচক্রের নিকট প্রজাদের দাবিটাই বা কত খানি——ইহাই যে অধিকারবলে নির্ণীত হয়, তাহাই রাষ্ট্রের মৌলিক বিধান।

অধিকারকে 'বিধান' বলিতেছি কেন? এই বিশিষ্ট অধিকারটি কতকগুলি স্থির নীতি বা সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সব নীতি বা সূত্র ধরিয়াই অধিকারটির বিচার ও কার্য্য হয়। সুতরাং বুঝিবার সুবিধার জন্য অধিকারকে বিধান বলিতেছি। অধিকার ভাবাত্মক শব্দ আর বিধান কর্ম্মাত্মক শব্দ।

ইংলণ্ডের কারখানা-আইন ও মাগ্‌নাকার্টা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা বুঝিলেই আইন ও মৌলিকবিধানের পার্থক্য সহজ-বোধ্য হইবে। 'কারখানা-আইনের' বলে প্রজারা শাসনচক্রের নিকট হইতে কোন বিশিষ্ট অধিকার পায় না। এমন কোন অধিকার পায় না যাহার বলে তাহারা শাসনচক্রের ক্ষমতা কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত করিতে পারে। এই আইনের উদ্দেশ্য একশ্রেণীর প্রজাকে আর একশ্রেণীর প্রজার হাত হইতে রক্ষা করা; কিন্তু মাগ্‌নাকার্টা শাসনচক্রের অবাধ প্রভুত্ব দমন করিয়াছে, শাসনচক্রকে নিয়মতন্ত্র করিয়াছে, প্রজার সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য শাসনচক্রকে বাধ্য করিয়াছে। এইজন্যই মাগ্‌নাকার্টা সামান্য আইন মাত্র নয়, উহা মৌলিকবিধান। ঐরূপ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রণীত ইংলণ্ডের বিল-অব-রাইটস্‌ও একটি মৌলিকবিধান। ইহার ফলে শাসনচক্রের দায়িত্ব-হীন অত্যাচার হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার অধিকার প্রজারা লাভ করিয়াছে। ইহাও শাসনচক্রের ক্ষমতাসঙ্কোচক। ঐরূপ ১৮৩২,

১৮৬৭, ১৮৮৪, ১৮৮৫ ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রজাদের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনাধিকার বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল বিধি ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্টে প্রণীত হয়, সেইগুলিও এক একটি মৌলিকবিধান, আইন মাত্র নয়।

মৌলিকবিধানগুলিকে যে এইরূপ ভাবে বিধিবদ্ধ হইতে হইবেই এমন কোন কথা নাই। ইংলণ্ডে এমন অনেক মৌলিকবিধান আছে, যাহা কালিকলমে লেখা নয় এবং পার্লিমেণ্টপ্রণীতও নয়। ব্যবহারের ফলে প্রথাস্বরূপে সেগুলি চলিয়া গিয়াছে এবং মৌলিকবিধানের সম্মান পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কাবিনেট' বা মন্ত্রিসভা গঠনের প্রথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রজাপ্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে লর্ডসভা ও প্রজাপ্রতিনিধিসভা এই উভয় সভা হইতে কোন-এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত বা একাধিক সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন সভ্যকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিবার প্রথা ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। সেই মন্ত্রিসভাই প্রকৃত শাসনচক্র। এই প্রথার অনুকূলে কোন আইন না থাকিলেও ইহার কার্য্যকারিতা আইনের অপেক্ষা কম নয়। এই প্রথা এখন মৌলিকবিধান হইয়া উঠিয়াছে। রাজা এখন ইচ্ছা করিলেও ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। এই প্রথা অমান্য করিয়া যে তিনি নিজের ইচ্ছামত যাহাকে-তাহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন সে-অধিকার তাঁহার আর নাই। সে-অধিকার এখন প্রজাপ্রতিনিধিদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে প্রজাদের ক্ষমতা যেমন বাড়িয়া গিয়াছে, রাজার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। অনিচ্ছা থাকিলেও রাজাকে এখন বাধ্য হইয়া প্রজাপ্রতিনিধিদের নির্ব্বাচিত মন্ত্রিদিগকে মানিয়া লইতে হয়। লিখিত মৌলিকবিধানের বিরুদ্ধ না হইলেও মার্কিনের কোন রাষ্ট্রনায়ক দুই বারের অধিক নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। ইতালীর লিখিত মৌলিকবিধানে কাবিনেট-(বা মন্ত্রিসভা)-গত প্রথার

কোন প্রসঙ্গ নাই, তথাপি ইংলণ্ডের মত এখানেও ঐ প্রথা চলিয়া গিয়াছে।

এমন কোন রাষ্ট্র নাই, যে রাষ্ট্রের যাবতীয় মৌলিকবিধানই লিখিত। লিখিত অলিখিত দুই প্রকার মৌলিকবিধানই প্রত্যেক রাষ্ট্রে চলিয়া গিয়াছে। তবে এখন মৌলিকবিধানগুলি লিখিয়া ফেলার দিকেই একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে; কিন্তু সে-ঝোঁক এখনও কোথাও সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই।

মৌলিকবিধানগুলি পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার শাসনচক্রের নাই। পরিবর্ত্তন করা দূরে থাকুক, সেগুলি অমান্য করিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই। শাসনচক্রের কোন কায যদি মৌলিকবিধানবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে-কায অসিদ্ধ বলিয়াই গণ্য হয়। মার্কিনের কংগ্রেস তাঁহাদের এলাকা বাড়াইতে পারেন না। তাঁহাদের কোন আদেশ বা ব্যবস্থা যদি তাঁহাদের এলাকার বাহিরে হয়, তাহাহইলে মার্কিনের আদালত তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যদি মৌলিকবিধানবিরুদ্ধ কোন কায করিয়া বসেন, তাহাহইলে তখনই তাঁহারা পার্লিমেণ্টে তিরস্কৃত হন এবং পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজারও সাধ্য নাই যে, কোন মৌলিকবিধান অমান্য করেন। প্রথম চার্লস মৌলিকবিধান অমান্য করিয়াই সকল বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন এবং নিজের শির বলিদান দিয়া সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। দ্বিতীয় জেমসের রাজ্যচ্যুতির কারণও ইহাই।

শাসনচক্র যদি মৌলিকবিধানের পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম, তবে সে ক্ষমতা কাহার? প্রজার বা প্রজাপ্রতিনিধিদের। ফ্রান্সের কোন মৌলিক-বিধানের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে জাতীয় সংসদের মত লওয়া আবশ্যক। বৃটিশদ্বীপে পার্লিমেণ্টের মত আবশ্যক। লর্ডসভা প্রজাপ্রতিনিধিসভা

ও রাজা—ইঁহারা সকলে একমত হইলে তবে কোন ব্যবস্থা প্রণীত পরিবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইতে পারে, মৌলিকবিধান সম্বন্ধেও সেই কথা। সাধারণত দেখা যায় যে, রাজার মত লওয়া একটা দস্তুর মাত্র, লর্ডসভা ও প্রজাপ্রতিনিধিসভা যে মত স্থির করেন, রাজা তাহাই মানিয়া লন। তাহা অমান্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে বটে, তবে সে ক্ষমতার পরিচয় তিনি কখন দেন না। লর্ডসভা যদি কোন প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী হন ও তাহা নামঞ্জুর করেন, তথাপি তাহা যদি প্রজাপ্রতিনিধিসভার ইচ্ছানুরূপ হয় ও তাঁহাদিগকর্ত্তৃক দুই বৎসরের মধ্যে তিনবার মঞ্জুর হয়, তাহাহইলেই তাহা আইন ও মৌলিকবিধান হইয়া যাইতে পারে। ইতালীতে পার্লিমেণ্টই মৌলিকবিধানের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই সেদিন তাঁহারা রাজার হাত হইতে সন্ধিবিগ্রহের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছেন (ডিসেম্বর ১৯১৯)। সুইজর্লণ্ডের কোন মৌলিকবিধানের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নিয়ম এই, পার্লিমেণ্টের উভয় সভার অধিকাংশ সভ্য পরিবর্ত্তনের সম্মতি দিলে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মত লওয়া হয়; অধিকাংশ ব্যক্তি সম্মত হইলে তখন আবার উহার সম্বন্ধে রাষ্ট্রান্তর্গত বিভিন্ন কাণ্টনের মত লওয়া হয়। সেখানেও অধিকাংশের সম্মতি পাইলে তবে পরিবর্ত্তনটি বিধিবদ্ধ হয়। এরূপ প্রথাকে ইংরেজীতে 'রেফারেণ্ডাম্' বলে। বাঙ্গলায় উহাকে 'প্রজার সম্মতিগ্রহণ' প্রথা বলা যাইতে পারে। (অষ্ট্রেলিয়াও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। পার্লিমেণ্টের উভয় সভার অধিকাংশ সভ্য পরিবর্ত্তন-প্রস্তাবে সম্মতি দিলে পর উহার সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত লওয়া হয়। অধিকাংশের মত পাইলে অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রকের মতামত লওয়া হয় এবং অধিকাংশের মত অনুসারে কায হয়।) সুইজর্লণ্ডে আরও একটি উপায় আছে। পার্লিমেণ্ট যেমন পরিবর্ত্তন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন,

পঞ্চাশ হাজার প্রতিনিধিনির্ব্বাচক তেমনি একটি আবেদন-পত্র দ্বারা উহা উপস্থিত করাইতে পারেন। এইরূপ আবেদন পত্রের ফলে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মতামত গৃহীত হয়। অধিকাংশের সম্মতি পাইলে এবং তৎপরে অধিকাংশ কাণ্টনের অনুমোদন পাইলে প্রস্তাব মত কার্য্য হয়। এইরূপ প্রথার ইংরেজী নাম 'ইনিশিয়েটিভ'; বাঙ্গলায় ইহাকে 'প্রজাদ্বারা প্রবর্ত্তনরীতি' বলা যাইতে পারে। স্পেনের নিয়ম, কোন মৌলিকবিধানের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কোন বিশেষ-পার্লিমেণ্টের নির্ব্বাচন গঠন ও অধিবেশন আবশ্যক হয়। মার্কিনের নিয়ম, রাষ্ট্রনায়ক কোন মৌলিকবিধানের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। কংগ্রেসের দ্বিতৃতীয়াংশ সভ্য তাঁহার যে-কোন সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিতে পারেন। কংগ্রেসের দ্বিতৃতীয়াংশ সভ্য একমত হইলে কংগ্রেস নিজে-হইতেই কোন মৌলিকবিধানের পরিবর্ত্তন বা সংযোজনের প্রস্তাব করিতে পারেন; কিন্তু মার্কিনের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রকগুলির দ্বিতৃতীয়াংশ যদি সেরূপ কোন পরিবর্ত্তনের বা সংযোজনের পক্ষপাতী হইয়া আবেদন করেন, তাহাহইলে কংগ্রেসকে একটি 'কন্‌ভেন্সন' বা বিচার-সমিতি গঠন করিয়া সেই সমিতি দ্বারা প্রস্তাব উপস্থিত করাইতে হয়, তারপর বিচারে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহা রাষ্ট্রকগুলির তৃচতুর্থাংশ দ্বারা সমর্থিত হইলেই বিধিবদ্ধ হয় এবং মৌলিকবিধানের মর্য্যাদা পায়। এইরূপ কঠোর প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায়, বৃটিশদ্বীপ ফ্রান্স বা সুইজর্লণ্ডের মত মার্কিনের মৌলিকবিধানের ক্রমবিকাশসাধন সাক্ষাৎভাবে সহজ-সাধ্য নয়। সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে মার্কিনের মৌলিকবিধান গুলির পরিবর্ত্তন ও সংযোজন আবশ্যক-হইলেই ঘটে। অন্যান্য রাষ্ট্রের আদালতগুলি রাষ্ট্রের মৌলিকবিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য; কিন্তু মার্কিনে অন্যনিয়ম। এখনকার আদালতগুলিই রাষ্ট্রের মৌলিকবিধানগুলির

ব্যাখ্যাকর্ত্তা। ব্যাখ্যাকর্ত্তা যখন যেরূপভাবে ব্যাখ্যা করেন, তখন মৌলিকবিধানগুলির সেইরূপ অর্থই দাঁড়ায়, ফলে বিধানগুলি স্থিতি-স্থাপক গুণবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যার ফলেই লুসিয়ানা ক্রীত হয়, ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে জাহাজের গতিরোধ-সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়, টেকসস্ রাষ্ট্রভুক্ত হয়, রেলের ও খালের জন্য এবং কৃষি-বিদ্যালয় প্রভৃতির জন্য ভূমিদান আইনসিদ্ধ হয় এবং কংগ্রেস (মুদ্রার বদলে) 'নোট' বাহির করিবার, মুদ্রা কিম্বা নোটে যাহাতে খুসী দেনা শোধ করিবার, রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যাঙ্কগুলির স্থাপন ও পরিচালন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ও ডাকবিভাগের একাধিপত্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

---

(৭)

শাসনচক্রের কর্ত্তব্য।

আবিসিনিয়ার মত যে সকল রাষ্ট্র একেশ্বরতন্ত্রমূলক, যে সকল রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য একজনের স্বেচ্ছামতই চলিয়া থাকে, আজকালকার দিনে সে সকল রাষ্ট্রকে ঠিক সভ্য রাষ্ট্র বলা হয় না। সেই সকল রাষ্ট্রই সভ্য, যে সকল রাষ্ট্র অল্পাধিক পরিমাণে গণতন্ত্রমূলক। রাষ্ট্র গণতন্ত্রমূলক হইলেই, শাসনচক্র কতকটা সংযত হইয়া চলেই এবং প্রজাদের হিত অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হয়।

গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে শাসনচক্রের এই যে সংযম ইহার মূল কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তি কেন হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল কেন? কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র আপনিই গড়িয়া উঠে?

আমাদের এই জগৎটা একটা ঘোর সংগ্রামক্ষেত্র; অন্য প্রাণীর

সহিত সংগ্রামের কথা থাক, মানুষের সহিত নিত্য সংগ্রাম করিয়াই মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। মানুষেরা পরস্পরে একদিকে যেমন মানুষ বলিয়া আত্মীয় আবার অন্যদিকে স্বার্থসংঘর্ষ বশত পরস্পরের ঘোর শত্রু। এইজন্যই মানুষমাত্রের মধ্যেই ভালমন্দ দুইটি বৃত্তিই খুব প্রবল, তবে আবশ্যক মত বা চেষ্টার ফলে বা অন্য কোন কারণে একটি বৃত্তি অপর বৃত্তিটিকে অভিভূত করিয়া রাখে, এই যা'।

মানুষকে শত্রু ও মিত্রের সহিত নিত্য কারবার করিতে হয় বলিয়া তাহাকে বেশ সাবধান হইয়াই চলিতে হয়। কখন কোন্ দিক্ হইতে কোন্ শত্রু তাহাকে আক্রমণ করিবে, তাহার ঠিক্ কি? সুতরাং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা বোধ হইতেই মানুষের মধ্যে এক একটি দলের উৎপত্তি ঘটে, আপনিই ঘটে, চেষ্টানিরপেক্ষ হইয়াই ঘটে, সংস্কারবশেই ঘটে। এই দলই ক্রমে রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই দলের কায—দলের ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা। সুতরাং রক্ষাকার্য্যই রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রপরিচালক শাসনচক্রের প্রধানতম কার্য্য।

রক্ষাকার্য্য দ্বিবিধ, যথা—বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষা ও অন্তঃ শত্রু হইতে রক্ষা। দলের বা রাষ্ট্রের বাহির হইতে যাহাতে কেহ দল বা রাষ্ট্রকে এবং দলের বা রাষ্ট্রের কাহাকেও আক্রমণ করিতে না পারে আবার দলের বা রাষ্ট্রের ভিতরকার কেহ যাহাতে দলের বা রাষ্ট্রের অথবা দলভুক্ত বা রাষ্ট্রভুক্ত অপর কাহারও কোন অহিত সাধন করিতে না পারে, সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা শাসনচক্রের কায।

এই দ্বিবিধ রক্ষাকার্য্য হইতেই শাসনচক্রের নানাবিধ কার্য্যের বা কর্ত্তব্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এক দিকে যেমন তাহাদিগকে সামরিক ব্যবস্থা করিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি দণ্ডবিধিও প্রণয়ন করিতে হয়। প্রথম প্রথম দণ্ড মানে ছিল—দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত,

জীবনের বদলে জীবন অর্থাৎ যে যেমন ক্ষতি করিবে তাহাকে ঠিক সেই-রূপ ক্ষতি ভোগ করান। ক্রমে দণ্ডের মানে বদলাইয়া যায় এবং দণ্ডের অর্থ হয় সংশোধন ও সংযমন। দোষ-প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখানই দণ্ড।

দোষপ্রবৃত্তির দমন শিখাইতে গিয়াই শাসনচক্রকে একদিকে যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটাইতে অন্যদিকে তেমনি আবার বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি প্রস্তুত করিতে হয়।

এই সকল বিধি যে প্রথম প্রথম কেহ বুদ্ধি খরচ করিয়া প্রস্তুত করিত, তাহা নয়। আবশ্যক মত আকস্মিক ভাবেই এইগুলি প্রস্তুত হইয়া যাইত। কোনরূপে কাজ সারিবার চেষ্টা হইতেই উহাদের উদ্ভব। কিন্তু পরে কোনরূপে কাজ সারার ভাব চলিয়া যায় এবং বুদ্ধি খরচ করিয়াই বিধি প্রণয়ণের বা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা চলে।

বিচার কার্য্য—দোষী নির্ণয়, দণ্ডের মাত্রা ও প্রকার নির্ণয়ও—প্রথম প্রথম কতকটা খামখেয়ালির উপর নির্ভর করিত, কিন্তু শেষে ইহার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

প্রথমে একজনকেই বা একটি ক্ষুদ্র শাসনচক্রকেই হয়ত বিধি-ব্যবস্থাপন, চৌকিদারীর কাজ, দোষীর বিচার, দোষীর শাস্তিবিধান ও যুদ্ধে নেতৃত্ব করিতে হইত। শেষে দলপুষ্টির ও কার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতা ঘটে। কর্ম্মচারীরা তাহাদের কার্য্যের জন্য রাষ্ট্রপ্রভুর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে ও তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে।

এতগুলি কার্য্যের নিয়ামক যদি একজন বা একদল লোক হয়, তাহা হইলে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে এবং এমন কি প্রজাদের উপর অত্যাচার চলিতে পারে। পারে নিশ্চয়ই; কিন্তু ঐরূপ যে সর্ব্বদা হইবেই, এমন কোন কথা নাই। কথা না থাকিলেও এক সময়ে কথা

উঠিয়াছিল, এই কার্য্যগুলিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে সমর্পণ করাই বিধেয়। তখন হইতে স্থির হয়, ব্যবস্থাপক সম্প্রদায় আইন প্রণয়ন করিবেন, বিচারক সম্প্রদায় সেই আইন মত বিচার করিবেন আর শাসকবর্গ বিচারকদের বিচার কার্য্যে পরিণত করিবেন তাছাড়া চৌকিদারীর কায ও যুদ্ধে নেতৃত্ব লইবার ভার তথা অন্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিবিগ্রহ সংক্রান্ত কার্য্যের ভারও গ্রহণ করিবেন।

রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক কয়েকজন মন্ত্রিকে লইয়া শাসকসম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহারাই প্রকৃত শাসনচক্র। মন্ত্রিরা সাধারণত রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের ভৃত্য মাত্র, তাঁহাদ্বারাই নিযুক্ত ও পদচ্যুত হইতে পারেন। মার্কিনের মন্ত্রিরা এখনও রাষ্ট্রনায়কের ভৃত্য মাত্র; সেদিন পর্য্যন্ত জর্ম্মন সাম্রাজ্যেও মন্ত্রিরা সম্রাটের ভৃত্য মাত্র ছিলেন; ইংলণ্ডের মন্ত্রিরা আইন মতে বা রাষ্ট্রের মৌলিকবিধান মতে রাজার ভৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নন। ফ্রান্সেও মন্ত্রিরা আইনমত রাষ্ট্রনায়কের ভৃত্য মাত্র। তবে কার্য্যত ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের মন্ত্রিরা রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের মতানুসারে না চলিয়া পার্লিমেণ্টের মতানুসারেই চলিয়া থাকেন এবং কার্য্যের জন্য পার্লিমেণ্টের নিকটই দায়ী থাকেন।

এই-যে পার্লিমেণ্ট ইহাই ব্যবস্থাপক সভা। প্রথমে ইহা রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের মন্ত্রণা-সভা ছিল এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মিলিত ও পরিচালিত হইত। মন্ত্রণাসভার মত মানিয়া চলিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু সকল সভ্যরাষ্ট্রেই এই মন্ত্রণাসভার প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়িয়া চলে এবং উহা প্রজাদের প্রতিনিধিসভায় পরিণত হয়। কিন্তু প্রতিনিধিসভা সকল রাষ্ট্রে সমান ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে নাই; কোন রাষ্ট্রে উহা শাসনচক্রকে নিজের অধীনে আনিয়াছে, কোন রাষ্ট্র বা তাহা পারে নাই। যেখানে পারিয়াছে, সেইখানকার শাসনতন্ত্র

পার্লিমেন্টি, আর যেখানে পারে নাই, সেইখানকার শাসনতন্ত্র অ-পার্লি-মেন্টি নামে পরিচিত হইয়াছে। এইজন্যই পার্লিমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও মার্কিন বা অধুনা-লুপ্ত জর্ম্মন সাম্রাজ্য অ-পার্লিমেন্টি, এবং ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের মন্ত্রিরা আইন মত রাজার নিকট সকল কার্য্যের দায়ী হইয়াও কার্য্যত পার্লিমেণ্টের প্রভুত্ব মানিয়া লওয়ায় ঐ দুই রাষ্ট্র পার্লিমেন্টি।

শাসনচক্র যদি ব্যবস্থাপক বিভাগের বা পার্লিমেণ্টের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন, তাহাহইলে যে অনেক সময়েই শাসনচক্রের অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে অনেক ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে, তাহা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনী এই তিন রাষ্ট্রের ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হয়। প্রবল শাসনচক্রের কার্য্যনীতির দোষেই ইংলণ্ড মার্কিন দেশ হারাইল, ফ্রান্সে বিপ্লব উপস্থিত হইল, জর্ম্মন সাম্রাজ্য ধ্বংস পাইল। অবশ্য ইহাও ঠিক যে শাসনচক্রের প্রবলতাই জর্ম্মন সাম্রাজ্যের উদ্ভবের কারণ। কিন্তু ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভবের সময় বা আকস্মিক বিপদকালে কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য শাসনচক্রের প্রাবল্য আবশ্যক হইলেও, রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলে শাসনচক্রকে সংযত হইয়া চলিতে হয় এবং যাহাদিগকে লইয়া রাষ্ট্র, তাহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে নাই। রুষরাষ্ট্রের পতন ও ধ্বংসের কারণও শাসনচক্রের অত্যধিক প্রাবল্য ও প্রজাদের মতামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন। রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত প্রজাদের স্বার্থ বিজড়িত, ইহা বুঝিয়া চলিতে শিখাইলে প্রজারা কখনই এরূপ বিদ্রোহ-স্বভাব হইয়া উঠিত না এবং রাষ্ট্রের ধ্বংস ডাকিয়া আনিত না।

শাসনবিভাগ ও ব্যবস্থাপক বিভাগের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী ভেদ-রেখা টানিয়া দেওয়া এই সব কারণেই কোন মতে সঙ্গত নহে। উহাদের মধ্যে কার্য্যগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে একটা যোগ থাকা আবশ্যক। যদি উভয় বিভাগের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে, তাহাহইলে

রাষ্ট্রকার্য্য সুচারুরূপেই চলিয়া থাকে, অন্যথা শাসনকার্য্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রভুত্ব বিষয়ে সাধারণত ব্যবস্থাপক বিভাগেরই শ্রেষ্ঠতা থাকিলে রাষ্ট্রের মঙ্গল হয়; কিন্তু সঙ্কটকালে ব্যবস্থাপক বিভাগ যদি শাসনবিভাগের নেতৃত্ব না মানিয়া লয়, তাহাহইলে আবার রাষ্ট্রের সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হয়। ফরাসীবিপ্লবের সময় বিপ্লবের স্রোত ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য এবং সদ্যসমাপ্ত যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রশত্রুদিগকে সংযত রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের নেতৃত্বে ও পরামর্শে ইংলণ্ডের ব্যবস্থাপক বিভাগ—পার্লিমেণ্ট—বহু কঠোর ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রজাদের আপাতত কষ্ট ও অসুবিধা হইলেও পরিণামে মঙ্গলই হইয়াছিল। রাষ্ট্র-রক্ষার জন্য উভয় বিভাগের এইরূপ নির্ভর ভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকা আবশ্যক। যে-রাষ্ট্রে এরূপ নির্ভর ভাবের অসদ্ভাব, বিপৎকালে আত্মরক্ষা করা সেই রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারে অসম্ভব না হইলেও সহজসাধ্য হয় না।

বিচারবিভাগ ব্যবস্থাপক বিভাগের প্রভুত্ব না মানিয়াই পারেনা। কারণ, ব্যবস্থিত আইন মত দোষীর বিচার করাই এই বিভাগের কায। আর, সেই আইনের কর্ত্তা ব্যবস্থাপক বিভাগ। কিন্তু ব্যবস্থাপক বিভাগের অধীন হইলেও বিচারবিভাগ যদি শাসনবিভাগের অধীন হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রে সুবিচার নানা কারণে অসম্ভব হইয়া উঠে। এইজন্যই শাসনবিভাগে ও বিচারবিভাগে যত দূরভাব থাকে ততই মঙ্গল। বিচারের অপক্ষপাতিত্ব চাহিলেই বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের প্রভাব হইতে দূরে রাখা আবশ্যক হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিভাগগুলির সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে ধূয়া উঠিয়াছিল তাহা রাষ্ট্ররক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল নয়। উহাদের মধ্যে কার্য্যগত স্বাতন্ত্র্য চাই বৈকি, তবে উহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না, উহাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকা চাই। তবে সে যোগসূত্রের মধ্যস্থলে

থাকিবে ব্যবস্থাপক বিভাগ, উহাই অপর দুই বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে এবং শাসনবিভাগ যেন সেই কর্ত্তৃত্ব অমান্য করিয়া বিচার বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রয়াস না পায়, পাইলেই ক্ষতি।

---

(৮)

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

যে-সকল রাষ্ট্র গণতন্ত্রমূলক নয়, সে-সকল রাষ্ট্রের শাসনচক্র নিজেদের ইচ্ছামত একটি মন্ত্রণাসভা গঠন করেন এবং সেই মন্ত্রণাসভাই ব্যবস্থাপক বিভাগের কায করে। এই মন্ত্রণাসভা সাধারণত মন্ত্রিদের লইয়াই গঠিত হয়, তখন মন্ত্রণা-সভা ও মন্ত্রি-সভায় কোন পার্থক্য থাকে না। কখন বা শাসনচক্র প্রজাদের মধ্য হইতে নিজেদের পছন্দ মত কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া মন্ত্রণাসভা গঠন করেন। এরূপ মন্ত্রণা সভাকে কোন মতেই মন্ত্রিসভা বলা চলে না। মন্ত্রিরাই প্রধান রাজকর্ম্ম-চারী, রাষ্ট্রসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের কর্ত্তা। তাঁহাদিগকে ও রাষ্ট্রনায়ককে লইয়াই শাসনচক্র বা শাসনবিভাগ। মন্ত্রিদের সকল কার্য্যের দায়িত্ব আছে, কিন্তু এইরূপ মন্ত্রণাসভার তেমন কোন দায়িত্ব নাই, মন্ত্রণাসভা পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত, সে পরামর্শ মন্ত্রিরা বা শাসনচক্র গ্রহণ করিলেন কিনা তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা-না-করা শাসনচক্রের ইচ্ছাধীন।

যে-সকল রাষ্ট্র গণতন্ত্রমূলক না হইলেও গণতন্ত্রতার দিকে অগ্রসর হইতে চাহে, সে সকল রাষ্ট্রের শাসনচক্র যাঁহাদিগকে লইয়া মন্ত্রণাসভা গঠন করেন, তাঁহাদের কতককে শাসনচক্র নিজেরা পছন্দ করিয়া বাছিয়া লন আর কতককে তাঁহাদেরই নির্দ্দিষ্ট বিধি-অনুসারে অর্থাৎ নির্ব্বাচন

সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে প্রজারা নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায়। এইরূপ ভাবে যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়, তাহারও মন্ত্রণার কোন বাধ্যকারী শক্তি থাকে না। তাহার সে মন্ত্রণা মত চলা-না-চলা শাসনচক্রের ইচ্ছা। (বৃটিশ ভারত রাষ্ট্র না হউক, উহা রাষ্ট্রাভাস এবং সকল কার্য্যে রাষ্ট্রের অনুকরণ করিতে চাহে। উহার ব্যবস্থাপক সভা পূর্ব্বে যাহা ছিল এবং এখন যাহা হইতে চলিয়াছে, তাহা এই শ্রেণীরই ব্যবস্থাপক সভা।)

যে-সকল রাষ্ট্র একেবারে গণতন্ত্রমূলক, সে সকল রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা গঠনে শাসনচক্রের কোন হাত নাই। রাষ্ট্রের মৌলিকবিধান অনুসারে প্রজারা যাঁহাদিগকে ইচ্ছা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারে। সেই প্রতিনিধিদের লইয়াই ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়।

কিন্তু ইংলণ্ড বা ইতালীর মত যে সকল রাষ্ট্র একেবারে গণতন্ত্রমূলক নয়, যেখানকার রাষ্ট্রনায়কত্ব বংশগত, যেখানে প্রচীন সামন্ত প্রথার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, সেই সকল রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কেবল প্রজা-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে লইয়াই গঠিত হয় না, সেখানে সামন্ত বংশীয়দেরও আসন আছে আর সে-আসন সাধারণত বংশগত।

যে-সকল রাষ্ট্র একেবারে গণতন্ত্রমূলক, সে-সকল রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়। প্রজাতন্ত্র আর 'রিপব্লিক' এক কথা। গণতন্ত্রেরই ইংরেজী নাম 'ডিমক্রেশী'। ডিমক্রেশী ও রিপব্লিক এক নয়। রিপব্লিক, ডিমক্রেশীরই শাখাবিশেষ। উহার অপর শাখা বৈধরাজতন্ত্র।

রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রমূলকই হউক আর বৈধরাজতন্ত্রমূলকই হউক, উহার ব্যবস্থাপক সভা যাহা মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা মানিয়া চলিতে শাসনচক্র সাধারণত বাধ্য থাকেন। অধুনালুপ্ত জর্ম্মন্ সাম্রাজ্যের মত বা মার্কিনের মত কোন কোন রাষ্ট্রের শাসনচক্র মৌলিকবিধানের ফলে সকল [illegible] জন্ত ব্যবস্থাপক সভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য না

হইতেও পারেন। যে-রাষ্ট্রে তাঁহারা ঐরূপ জবাবদিহি করিতে বাধ্য হন না, সে-রাষ্ট্র অ-পার্লিমেণ্টারী রাষ্ট্র বলিয়া কথিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সহিত ব্যবস্থাপক বিভাগের প্রধান প্রভেদ এই যে, শাসনকার্য্য একজনের নেতৃত্বে চলিতে পারে, বিচার কার্য্যেও একজনের দক্ষতাই যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মন্ত্রণাকার্য্যে ও ব্যবস্থাপন কার্য্যে একাধিক ব্যক্তির যুক্তি আবশ্যক। একজনে যাহা ভাল বলিয়া স্থির করেন, অপরে হয় তো তাহাতে অনেক দোষ দেখিতে পান। এইজন্যই এক মাথার অপেক্ষা দুই মাথার এবং দুই মাথার অপেক্ষা দুইশত মাথার যুক্তি অধিকতর শ্রেয়। আর শ্রেয় বলিয়াই বহু জনকে লইয়াই ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। অন্তত কত জনকে লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে কোন বাঁধ-ধরা নিয়ম নাই। মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাপনা কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে পারে, এরূপ বুঝিয়া সভ্য সংখ্যা মোটামুটি ভাবে ঠিক করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে কিছু আসিয়া যায় না, যদি কার্য্যবিধি পূর্ব্ব হইতে ঠিক্ করা থাকে এবং সেই কার্য্যবিধি মানিয়া চলিবার মত প্রকৃতি সভ্যদের থাকে। নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি চারিজনও কোনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেনা, পক্ষান্তরে শত শত নিয়মনিষ্ঠ লোকও নির্ব্বিবাদে সকল বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে ব্যবস্থাপক সভা বসিয়াছিল তাহার সভ্যসংখ্যা ছিল—বার শত। এত অধিক সংখ্যক সভ্য লইয়া অধুনা আর কোন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয় নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিনের প্রজাপ্রতিনিধিসভার সংখ্যা ছিল ৩৮৬, বৃটিশদ্বীপে ছিল ৬৭০, ফ্রান্সের ছিল ৫৮৪, জর্ম্মণীর ছিল ৩৯৭, ইতালীর ছিল ৫০৮ এবং স্পেনের ছিল ৪৩১। একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-বিধি ভিন্ন যে এইরূপ এক একটি বড়

সভার কায কোন মতেই সুচারুরূপে চলিতে পারেনা, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কার্য্যবিধির অভাবেই ফ্রান্সের উপরিউক্ত ব্যবস্থাপক সভা একটা হট্টমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। তাই এখন ঠেকিয়া শিখিয়া প্রায় সকল বড় রাষ্ট্রেরই ব্যবস্থাপক সভা নিজেদের কার্য্যবিধি ঠিক্ করিয়া লইয়াছেন এবং সেই বিধি-অনুসারে চলিয়া থাকেন। সে বিধি যে অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা নয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই তাহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা বিলোপন করিতে পারেন। এইরূপ বিধির সংখ্যা এখন এত বেশী হইয়াছে যে, সেগুলি আয়ত্ত করিতে কোন কোন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের পুরা এক মুশুম কাটিয়া যায়।

এই সকল বিধি, সকল ব্যবস্থাপক সভায়, সমান নয়। বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন বিধি। তবে মোটামুটি ভাবে সেগুলিকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। যথা—(১) সাধারণভাবে আলোচনা রীতি (যেমন ইংলণ্ডে) ;(২) বিশিষ্ট সমিতির হাতে সমর্পণ রীতি (যেমন ফ্রান্সে ও মার্কিনে) ; ও (৩) সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের মতামত গ্রহণ রীতি (যেমন সুইজর্লণ্ডে)।

প্রথম রীতিটি এইরূপ। প্রজাপ্রতিনিধিসভার কোন সভ্য কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে চাহিলে তিনি পূর্ব্বে তাহা সভাকে জানান এবং যথাসময়ে তাঁহার পালা আসিলে তিনি সে ব্যবস্থা উপস্থিত করা সম্বন্ধে সভার মত প্রার্থনা করেন। তখন সভা মত দিলে তিনি নিজে ও তিনি যাঁহাদের নাম দিয়াছেন তাঁহারা কয়েকজন—সকলে মিলিয়া ব্যবস্থা প্রস্তুত করেন ও যথাসময়ে সভায় উপস্থিত করেন। যদি তিনি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন, তাহাহইলে তখনই তিনি প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। সভার যিনি নায়ক থাকেন (ইংরেজীতে যাঁহাকে স্পিকার বলে), তিনি সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তাবককে

আহ্বান করিলে, প্রস্তাবক তাহা সভার কেরাণীর হাতে তুলিয়া দেন। কেরাণী তখন উচ্চকণ্ঠে সেই প্রস্তাবের শিরোনামা (বা টাইটেল) পড়িয়া সকলকে শুনান। তারপর 'প্রস্তাবটি প্রথমবার পড়া হউক এবং ছাপান হউক' এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব তখনি বিনা বিতর্কেই স্থির হইয়া যায়। তারপর কবে উহা দ্বিতীয়বার পড়া হইবে তাহাও স্থির হইয়া যায়। সেই দিন আসিলে প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করা হয় এবং উহা দ্বিতীয়বার পড়া হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সভ্যদের মতামত লওয়া হয়। যদি শেষে পড়াই স্থির হয় তাহাহইলে প্রস্তাবটি লইয়া সভ্যদের সকলের মধ্যে একটা বিতর্ক চলিতে থাকে, প্রত্যেক বিধিটি উপবিধিটি পর্য্যন্ত লইয়া আলোচনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মতামত লইয়া একটা মীমাংসা স্থির হইয়া যায়, এইরূপ আলোচনার ফলে বিধিটি অক্ষুণ্ণও থাকিতে পারে, আবার পরিবর্ত্তিতও হইতে পারে। যাহা হউক, তারপর শেষ বিচারের জন্য একটি দিন স্থির হয়। সেই দিন সংশোধিত প্রস্তাবটি লইয়া আবার আলোচনা হয় এবং যদি আর কোনরূপ সংশোধন না হয়, তাহাহইলে উহা তৃতীয় বা শেষবার পঠিত হইয়া সেনেট বা লর্ডসভায় চলিয়া যায়। সেখানেও ঐরূপ পাঠ ও আলোচনার পর উহা অসংশোধিত অবস্থায় আসিলে এবং রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক তাহাতে সম্মতি দিলে তাহা আইনে পরিণত হয়। সেনেট বা লর্ডসভা যদি কোনরূপ সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করেন, তাহাহইলে প্রজাপ্রতিনিধিসভা ইচ্ছা করিলে সে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আর একবার বিচার করিতে দেখিতে পারেন। (১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যে ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়, তাহাতে লর্ডসভা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিলেও প্রজাপ্রতিনিধি সভা সেজন্য উহার পুনর্বিচার করেন নাই।) এইরূপ প্রথার উপকারিতা এই-যে, একটা হঠাৎ খেয়ালের বা উন্মাদনার বশে

কোন আইনের সৃষ্টি হইতে পারেনা এবং প্রস্তাবমাত্রের সকল দিক্ ভাল করিয়া বুঝিবার সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়।

তাড়াতাড়ি অনেক কায সারিবার জন্যই দ্বিতীয় রীতিটির উদ্ভব। এই রীতির চরম বিকাশ দেখা যায় মার্কিনের প্রজাপ্রতিনিধি সভায়। সেখানেও আলোচনার পূর্ব্বে প্রস্তাবটি দুইবার পঠিত হয়। কিন্তু সে পাঠ নামমাত্র পাঠ; কেরাণী কেবল শিরোনামা পাঠ করিয়া শুনাইলেই যথেষ্ট হয়। তারপর আলোচনা ও বিচারের জন্য উহা একটি বিশিষ্ট স্থায়ী সমিতির হাতে সমর্পিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব আলোচনার জন্য এইরূপ স্থায়ী সমিতির সংখ্যা কখনও কখনও ত্রিশেরও বেশী হয়। এই স্থায়ী সমিতিগুলির গঠনকর্ত্তা সভানায়ক। তিনি বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত (সাধারণত দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রতিনিধিদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া এক একটী স্থায়ী-সমিতি গঠন করেন। এইরূপ সমিতির হাতে পড়িয়া খুব অল্প সংখ্যক প্রস্তাবই অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষা পায়। কোন প্রস্তাবকেই একেবারে বাতিল করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কিন্তু তাঁহারা কখনও বিরুদ্ধ মত জানাইয়া কখনও উহার পরিবর্ত্তস্বরূপ অপর-এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া আর কখনও বা উহার প্রতি অগ্রাহ্যভাব দেখাইয়াই প্রস্তাবটিকে আইনে পরিণত হইতে দেন না। এইরূপ রীতির ফলে প্রজাপ্রতিনিধিসভা অনেক বাজে প্রস্তাবের আলোচনার হাত হইতে রক্ষা পান এবং কোন সভ্যই কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ভাব দেখাইতে পারেন না।

ফ্রান্সেও এইরূপ প্রথা আছে। কিন্তু সেখানে কোন স্থায়ী সমিতি নাই। প্রজাপ্রতিনিধিরা লটারি করিয়া নিজেদিগকে এগারটী দলে ভাগ করেন। তারপর কোন প্রস্তাব বিচার করিতে হইলে সেই এগারটী দল হইতে কয়েকজনকে লইয়া একটি বিশিষ্ট বিচারসমিতি গঠিত হয়।

প্রত্যেক দলই এই সমিতির জন্য আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে সমিতি গঠনের দোষ এই যে, শাসনচক্র যে প্রস্তাবটিকে আইনে পরিণত করিতে ইচ্ছুক, তাহা হয়ত তাঁহাদের বিরুদ্ধ পক্ষের হাতে গিয়া পড়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সুইজর্লণ্ডে রাষ্ট্রের মৌলিকবিধান পরিবর্ত্তন-ব্যবস্থা আলোচনা করিবার সময় তৃতীয় রীতিটির পরিচয় দিয়াছি। 'রেফারেণ্ডাম' (প্রজার সম্মতি গ্রহণ প্রথা) ও 'ইনিশিয়েটিভ' (প্রজার দ্বারা প্রবর্ত্তন রীতি) ছাড়াও আর একটি প্রথা আছে, তাহাকে 'প্লেবিসাইট' বলে। কোন বিশিষ্ট ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাসনচক্র যদি নিজে হইতে প্রজাদের মতামত গ্রহণ করেন অথচ সেই মতামত মানিয়া চলিতে বাধ্য না থাকেন, সেই মতামতকে কেবল নিজেদের মত নির্দ্ধারণের উপায় মাত্র স্বরূপে মনে করেন, তাহাহইলে সেইরূপ মতামত গ্রহণকে 'প্লেবিসাইট' (বা প্রজার অনুমোদন গ্রহণ প্রথা) বলে।

সুইজর্লণ্ডে 'রেফারেণ্ডাম' ও 'ইনিশিয়েটিভ' প্রথার ব্যবহার খুব বেশী। ইংলণ্ডে প্লেবিসাইট গ্রহণের দৃষ্টান্ত বহুবার দেখা গিয়াছে। শাসনচক্র যদি কোন ব্যবস্থাকে আইনে পরিণত করিতে দৃঢ়কল্প হন আর প্রজাপ্রতিনিধিরা (বা লর্ডসভা) যদি তাহাতে অসম্মতি দেন, তাহাহইলে তাঁহারা পার্লিমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নব-নির্ব্বাচিত সভ্যেরা ব্যবস্থাটি সম্বন্ধে অনুকূল প্রতিকূল যেরূপই মত দিন না কেন, সেই মতই প্রজাসাধারণের মত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়।

সুইজর্লণ্ডের কোন কোন কাণ্টনে অতি প্রাচীন কাল হইতে 'লাণ্ডস্‌জেমিণ্ড' বা বারোয়ারি ব্যবস্থা আছে। বৎসরের মধ্যে একবার কাণ্টনবাসী সকলে একটি মাঠে জড় হইয়া আগামী বর্ষের জন্য কর নির্দ্ধারণ করে, আইন প্রণয়ন করে, এবং শাসনকর্ত্তৃপক্ষদিগকে নির্ব্বাচন

করে। মার্কিনের নিউ-ইংলণ্ড, পেন্‌সিলভেনিয়া, নিউ-ইয়র্ক, কালিফর্নিয়া ইলিনোয়া প্রভৃতি বহুরাষ্ট্রকেই লাণ্ডস্‌জেমিণ্ডের অনুরূপ বারোয়ারি ব্যবস্থা দেখা যায়। টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইলেই রাষ্ট্রকবাসীদের মতামত লইতে হয়। ম্যুনিসিপাল-ব্যাপারেও তথায় রেফারণ্ডামের ব্যবস্থা আছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ডাকোটা ও ওয়াসিংটনের এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ওরিগণের রাষ্ট্রপ্রজারা একজোট হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে নির্ব্বাচন-অধিকার দিবার বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করিয়াছিল। তাহাও লাণ্ডস্‌জেমিণ্ডের অনুরূপ কাণ্ড।

মার্কিনের রাষ্ট্রপ্রজারা ক্রমশ তাহাদের প্রতিনিধিসভার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে এবং সেইসঙ্গে রেফারেণ্ডাম ও ইনিশিয়েটিভ ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইতেছে। যেরূপ সব লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, শীঘ্রই মার্কিনে ঐ দুই প্রথার খুব বেশী প্রভাব দেখা যাইবে।

এইরূপ প্রথা ভাল কি মন্দ, সেসম্বন্ধে কোন কথা জোর করিয়া বলা চলেনা। সুইজর্লণ্ডে এই প্রথার কার্য্যকারিতা দেখিয়া সকলে একমত হইতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও মতে উহা ভাল, কেননা প্রজা প্রতিনিধিরা লোভে বা ভয়ে পড়িয়া অনেক সময়ে ঠিক্ সিদ্ধান্ত করেন না প্রজাদের কিন্তু সেরূপ ভয় বা লোভের কোন কারণ নাই, তাহারা নিজেরা বুঝিয়া যাহা মীমাংসা করিবে, তাহা ভাল হইবেই। কিন্তু অপর পক্ষ বলেন—তাহা ঠিক নয়, সাধারণ প্রজারা নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার লইয়াই এত ব্যস্ত থাকে যে, সাধারণ ব্যাপারে ভাল করিয়া মন দিবার অবসর (এবং অনেক সময় শক্তিও) তাহাদের থাকেনা; তাছাড়া আইন-প্রণয়ন-বিদ্যা চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়, উহা কাহারও পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ নয়। সুতরাং অজ্ঞ ও অসাবধান, অসহিষ্ণু ও সহজে-পর-

পরিচালিত প্রজারা যাহা স্থির করিবে তাহা প্রকৃত পক্ষে হিতকর না হইয়া অহিতকরও হইতে পারে ; কাজেই আইন প্রণয়নের ভার একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর হাতেই থাকা ভাল।

---

(৯)

ব্যবস্থাপক বিভাগ (২)।

পূর্ব্বে রাজাদের একটি করিয়া মন্ত্রিসভা ছিল। সকল মন্ত্রিই একত্র বসিয়া মন্ত্রণা করিতেন। এখন সাধারণত সেরূপ নিয়ম আর নাই। এখনকার মন্ত্রিরা দুইপ্রকার। একপ্রকার মন্ত্রিরা ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট। অপর প্রকার মন্ত্রিরা যাহা ব্যবস্থিত হয় তাহাই কার্য্যে পরিণত করেন। দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্রিরাই শাসনচক্র নামে পরিচিত। তাঁহাদের কথা পরে হইবে।

ব্যবস্থাপক মন্ত্রিরা সকলেই পূর্ব্বে একত্র বসিয়া ব্যবস্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। যাঁহারা অভিজাত বা সামন্তসর্দ্দার তাঁহারা একটি বৈঠকে বসেন আর যাহারা সাধারণ প্রজা তাহাদের প্রতিনিধিরা আর একটা বৈঠক বসেন। প্রথম দলের বৈঠকের নাম অভিজাতসভা (বা লর্ডসভা) আর দ্বিতীয় দলের বৈঠকের নাম হয় সাধারণপ্রজাসভা বা প্রজাপ্রতিনিধি সভা। অভিজাতসভার স্থলে কোথাও কোথাও বিশিষ্টপ্রজাপ্রতিনিধি লইয়া একটি 'সেনেট' গঠিত হয়।

এখন প্রায় সকল রাষ্ট্রেই অভিজাতসভা বা সেনেট এবং প্রজা প্রতিনিধিসভা আছে। একমাত্র গ্রীসে কেবল তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়। সেখানে কেবল একটিমাত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে।

দুই প্রকার ব্যবস্থাপক সভা আছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিকে দ্বি-ব্যবস্থাপক (বা বাইকেমারেল) রাষ্ট্র আর গ্রীসের মত রাষ্ট্রকে এক-ব্যবস্থাপক (ইউনিকেমারেল) রাষ্ট্র বলে।

দ্বি-ব্যবস্থাপক রাষ্ট্র ভাল কি এক-ব্যবস্থাপক রাষ্ট্র ভাল তাহা লইয়া বড় একটা মতভেদ দেখা যায় না। প্রায় সকল পণ্ডিতেরই মত যে দ্বি-ব্যবস্থাপক রাষ্ট্রই ভাল। কারণ, রাষ্ট্রে একটি মাত্র ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে ব্যবস্থাপকেরা কতকটা নিরঙ্কুশ ভাবে কায করিয়া থাকেন এবং ক্ষণিক ভয়ের বশে যাহা-তাহাও করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু দ্বি-ব্যবস্থাপক রাষ্ট্রে তাহা হইবার যো নাই। এক সভা আর এক সভার কায তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিয়া ভুল ভ্রান্তির পথ কমাইয়া দেয় এবং ক্ষণিক আবেগের বশে যাহাতাহা ব্যবস্থা করিবার সম্ভাবনাও দূর করে। ফলে, কোন ব্যবস্থাতেই অস্থিরচিত্ততার বা হঠকারিতার চিহ্ন বড় একটা থাকেনা। দুইটি ব্যবস্থাপক সভা থাকার এই উপকারিতা লক্ষ্য করিয়া একজন পণ্ডিত বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"এক-ব্যবস্থাপক রাষ্ট্রে সুশাসন অসম্ভব।" তাঁহার এই উক্তি পুরাপুরি ভাবে সত্য না হইলেও একথা ঠিক্ যে, রাষ্ট্রে একটি মাত্র ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে বিপদের ও হঠকারিতার যতটা সম্ভাবনা, দুইটি ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে সে-সম্ভাবনা ততটা থাকে না। ইতিহাসেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোন একজন মন্ত্রি সুবক্তা হইলেই তিনি মনোহর বাক্যজালে সকলকে মুগ্ধ করিয়া সভাকে দিয়া নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করাইয়া লইতে পারেন। ফরাসীবিপ্লবকালে ফ্রান্সে একটি মাত্র ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ফল যে কি বিষময় হইয়াছিল, তাহা ফরাসীইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন।

রাষ্ট্রে দুইটি ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে প্রজাদের রাষ্ট্রপ্রভুত্বের হানি

ঘটে কিনা ? এরূপ প্রশ্ন যে একেবারে না উঠে, তাহা নয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হানিকরই বটে। কিন্তু সেরূপ উক্তির সারবত্তা বুঝা যায় না। রাষ্ট্রপ্রভুত্ব যে কি শক্তি তাহা যদি মনে থাকে, তাহাহইলে এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর স্থির করিতে কষ্ট হইবে না। প্রজারা যদি শারীর শক্তিতে প্রবল হয় আর প্রজারাই যদি ব্যবস্থাপক সভার মূল হয়, তাহা-হইলে ব্যবস্থাপক সভা একটিই হউক আর দশটিই হউক, সকলগুলির মূলই যখন প্রজা, তখন প্রজারা রাষ্ট্রপ্রভু না হইয়া অপরে হইবে কেমন করিয়া ? যাহার নিজের শক্তি বা অধিকার পরের নিকট হইতে ধার-করা, সে কি আর রাষ্ট্রপ্রভু হইতে পারে ? সুতরাং দ্বিব্যবস্থাপক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রভুত্ব প্রজাদের হাতে থাকেই না, এরূপ বলিতে যাওয়া সঙ্গত নয়।

সঙ্গত না হইলেও কিন্তু ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি মাত্র ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। একটির স্থলে দুইটি ব্যবস্থাপক সভা গঠনের কথা উঠিলে সকলে বিরক্ত হয়। সকলেই মনে করিতে থাকে, ঐ প্রস্তাব গৃহিত হইলে রাষ্ট্রে আবার অভিজাতবর্গের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স আবার একবার ঐরূপ ভুল করে। ঐ বৎসর জর্ম্মনীতে যে পার্লিমেণ্ট বসে, তাহাও এক-ব্যবস্থাপক। মার্কিনের কোন কোন রাষ্ট্রকেও একটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করিয়া কায চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল,কিন্তু এখন সকল রাষ্ট্রকেই দুইটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে।

প্রজাপ্রতিনিধি সভার সভ্যেরা এখন সকলেই প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। (তবে বৃটিশ ভারতের মত কোন কোন রাষ্ট্রাভাসে তাঁহারা হয় শাসনচক্রকর্তৃক মনোনীত আর নয় আংশিক ভাবে মনোনীত ও আংশিক ভাবে প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত।) অভিজাত-সভা বা সেনেটের সভ্যেরা কিন্তু সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হন না। কোন কোন রাষ্ট্রে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হন (যেমন, ফ্রান্সে, সুইজর্লণ্ডে, ডেনমার্কে,

হলণ্ডে, বেলজিয়মে এবং নরওয়েতে ও সুইডেনে); কোন কোন রাষ্ট্রে তাঁহারা শাসনচক্রকর্ত্তৃক মনোনীত হন (যেমন ইতালীতে, ও রাষ্ট্রভাস কানাডাতে)। কোন কোন রাষ্ট্রে বা তাঁহারা মনোনীত বা নির্ব্বাচিত হন না, বংশানুগতভাবে সভ্যপদ প্রাপ্ত হন (যেমন ইংলণ্ডে); কোন কোন রাষ্ট্রে আবার এই তিন রকম প্রথাই বা অন্তত দুই রকম প্রথা বিদ্যমান দেখা যায়। মিশ্রিত প্রথাই এখন প্রায় সাধারণ বিধি হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে যদিও বংশানুগত অধিকার প্রথা বিদ্যমান, তথাপি চারিজন আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের জন্য সভ্যপদে মনোনীত করার প্রথাও বিদ্যমান আছে। ইতালীতে মনোনয়ন-প্রথা থাকিলেও রাজবংশীয়েরা উত্তরাধিকার-সূত্রে সেনেটে স্থান পান। প্রুসিয়ার সেনেটে উত্তরাধিকার সূত্রে কেহ কেহ যেমন স্থান পাইতেন, তেমনি কয়েক জনকে রাজা যাবজ্জীবনের জন্য মনোনীত করিতেন আবার তেমনি প্রজারাও কয়েকজনকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইত।

অভিজাতসভা বা সেনেটে যে-সকল সভ্য প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের নির্ব্বাচনে একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণত তাঁহারা সকল প্রজাদ্বারা নির্ব্বাচিত হন না। কোথাও তাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রক-সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন (যেমন মার্কিনে,ব্রেজিলে, কিউবায়); কোথাও তাঁহারা বিভিন্ন সঙ্ঘের সম্মিলিত অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হন (যেমন ফ্রান্সে)। ফ্রান্সের প্রজাপ্রতিনিধিরা, ম্যুনিসিপালের নির্ব্বাচিত কর্ত্তারা এবং প্রদেশের ও নগরের ব্যবস্থাপক সমিতির নির্ব্বাচিত সভ্যেরা সকল একত্র হইয়া সেনেট সভার সভ্য নির্ব্বাচন করেন।

এই সকল যাবতীয় প্রথার মধ্যে উত্তরাধিকার প্রথার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকলেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে। জ্ঞানীর ছেলে যেমন জ্ঞানী বা কবির ছেলে যেমন কবি হইবেই এমন কোন কথা নাই, সেইরূপ

সুব্যবস্থাপকের ছেলে সুব্যবস্থাপক হইবেই এমন কোন কথা নাই। এইজন্য নূতন রাষ্ট্রগুলিতে উত্তরাধিকারসূত্র মানা হয় না। যেখানে ঐ প্রথা আছে, সেখানে উহা প্রাচীন ব্যবস্থার চিহ্নমাত্র হইয়া আছে। নির্ব্বাচনপ্রথাও দোষ-শূন্য নয়। যিনি নির্ব্বাচিত হন, তিনি যে সবসময় যোগ্য ব্যক্তি তাহার কোন মানে নাই। বরং অনেক সময়ই দেখা যায়, যিনি কোন কারণে লোকপ্রিয় হইতে পারেন, তিনি অযোগ্য হইলেও নির্ব্বাচিত হন। যোগ্য ব্যক্তিরা তো অনেক সময়ই নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হন না। তাঁহাদের টানিয়া বাহির করিতে যাইলে মনোনয়নই আবশ্যক হয়। ইতালীতে সেইরূপ লোকই মনোনীত হন, যাঁহারা কোন সরকারী কায করিয়া যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাইয়াছেন বা সাহিত্য বিজ্ঞান চিত্রবিদ্যা বা ঐরূপ কোন বিদ্যাতে বা লোকহিতকর কার্য্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তবে একথাও ঠিক যে, মনোনয়নেও পক্ষপাতিত্ব ঘটিতে পারে।

এই-যে দুই ব্যবস্থাপক সভা, অর্থসংক্রান্ত বিষয় ভিন্ন অপর সকল বিষয়েই উহাদের অধিকার ও ক্ষেত্র ও মর্য্যাদা সমান। এক সভা যাহা ব্যবস্থিত করিতে চান অপর সভা তাহা সংশোধন, পরিবর্দ্ধন এবং এমন কি পরিবর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে পারেন আর স্থলবিশেষে তাহাও করিয়া থাকেন। একের প্রস্তাব অপরের দ্বারা সমর্থিত হইলেই প্রস্তাবটি বিধিবদ্ধ বা আইনে পরিণত হয়।

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজাতসভা বা সেনেটের অধিকার সকল রাষ্ট্রে সমান নয়। ইংলণ্ডের নিয়ম এই, প্রজাপ্রতিনিধিসভা আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তাব উত্থাপন, সংশোধন, সমর্থন এবং এমন কি বিলোপন পর্য্যন্ত করিতে পারেন ; কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার অভিজাতসভার নাই। তাঁহারা কেবল নামমাত্র সমর্থন করিয়া থাকেন ;

কিন্তু তাঁহাদের সে সমর্থনের কোন মূল্য নাই; সেটি কেবল একটি নিয়ম-রক্ষা। হলণ্ডের নিয়ম এই-যে, সেনেটসভা অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু সংশোধন করিতে পারেন না। প্রুসিয়াতেও সেই নিয়ম ছিল। ফ্রান্সেও সেই নিয়ম, তবে সেনেটসভার সংশোধনের ক্ষমতা আছে কিনা তাহা আজও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। মার্কিনের নিয়ম কিন্তু এই-যে, সেখানে অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব অবশ্য তুলিবেন প্রজা-প্রতিনিধিসভা, তবে অন্যান্য প্রস্তাবের মত এই প্রস্তাবও সেনেটসভা সংশোধন ও সমর্থন করিতে পারিবেন। সুইজর্লণ্ডে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে উভয় সভার অধিকার ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে সমান। অষ্ট্রীয়ার নিয়ম এই যে, অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে উভয় সভার মতানৈক্য ঘটিলে যে-সভা কম অর্থ মঞ্জুর করেন সেই সভার মতই গ্রাহ্য করিয়া লওয়া হইবে।

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে উভয় সভাকে সমান প্রাধান্য না দিবার কারণ এই, উভয় সভার মতানৈক্য ঘটিলে অর্থের অভাবে রাষ্ট্রের সকল কায বন্ধ হইয়া যাইবে, ফলে রাষ্ট্রের সার্থকতাই নষ্ট হইবে। অপর সকল বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে সেরূপ আশঙ্কার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, সেই সব প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে বিলম্ব ঘটিলে বা সেগুলি আপাতত পরিবর্জ্জিত হইলেও রাষ্ট্রের তেমন সাংঘাতিক ক্ষতি হয় না। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে যখন সে কথা খাটে না, তখন কোন-একটি সভাকে প্রাধান্য না দিয়া উপায় নাই আর যদি প্রাধান্য দিতে হয় তবে প্রজাপ্রতিনিধি-সভাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত; কারণ, এই সভা যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, অপর সভা সেরূপ করেন না।

রাষ্ট্রের মৌলিকবিধান সম্বন্ধেও সেনেট বা অভিজাতসভার অধিকার সাধারণত কিছু কম। যে-বিধানে প্রজাপ্রতিনিধিসভার অধিকারে ক্ষমতায় বা মর্য্যাদায় হাত পড়ে, এমন কোন বিধানের প্রস্তাব করিতে

সেনেট বা অভিজাতসভা পারেন না। আবার, প্রজাপ্রতিনিধিসভা যদি মৌলিকবিধানের কোন পরিবর্ত্তনের বা সংশোধনের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে তাহাতে বাধাদিবার অধিকার সেনেট বা অভিজাতসভার আছে; কিন্তু প্রজাপ্রতিনিধি সভার প্রস্তাব যদি রাষ্ট্রপ্রজাদের মনোমত হয়, তাহাহইলে শেষে তাঁহাদিগকে মত দিতেই হয়; না দিলে রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক নূতন সভ্য স্থষ্টির ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে মত দিতে বাধ্য করেন। ইংলণ্ডের অভিজাতসভা এইরূপভাবে বাধ্য হইয়া একাধিক বার মত দিয়াছেন; যথা,১৮৩২খৃষ্টাব্দে প্রজাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনাধিকার বৃদ্ধি বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিবার কালে, ১৮৪৬খৃষ্টাব্দে শস্তের আমদানী রোধক আইন তুলিয়া দিবার কালে, আবার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চগুলির সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার কালে। কিন্তু সেনেট বা অভিজাতসভা যদি এমন বুঝেন যে, প্রজাপ্রতিনিধি সভা মৌলিকবিধানের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন সাধক যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা রাষ্ট্রপ্রজাদের মনোনীত না হইবারই সম্ভাবনা, অথবা অমনোনীত, তাহাহইলে তাঁহারা আপত্তিকর বুঝিলে শেষপর্য্যন্ত সেই প্রস্তাবে কান দেন না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গ্লাডোষ্টনের 'আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসন-সংস্থাপক প্রস্তাব' তাঁহারা এইজন্যই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কোন্ প্রস্তাব প্রজাদের মতানুগত, তাহা স্থির করিবার দুই উপায়; প্রথম, যাঁহারা প্রস্তাব করিতে চান তাঁহারা যদি নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব হইতেই সেই প্রস্তাব রাষ্ট্রপ্রজাদের জানাইয়া থাকেন এবং নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্যে যদি তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহাহইলে ধরিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহাদের প্রস্তাব রাষ্ট্রপ্রজাদের মতানুগত; দ্বিতীয়, নির্ব্বাচন কালে প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথা যদি না হইয়া থাকে, তাহাহইলে উভয় সভার বিশেষ মতানৈক্য ও বিরোধ স্থলে রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক প্রজাপ্রতিনিধিসভা

ভাঙ্গিয়া দেন এবং পুনর্নির্ব্বাচনের অবসর দেন। যদি পুনর্নির্ব্বাচনের ফলে প্রস্তাবের অনুকূল সভ্যদিগের সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহাহইলেও বুঝা যায় যে, প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপ্রজাদের অনুমোদিত। সেইরূপ অনুমোদিত প্রস্তাব শেষপর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করা সেনেট বা অভিজাতসভার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

কোন-একটি প্রস্তাব লইয়া যাহাতে উভয় সভার মধ্যে অনর্থক বিরোধ না ঘটে এবং সেই বিরোধের ফলে পার্লিমেণ্টের সকল কায পণ্ড হইতে না বসে, এজন্য কোন কোন রাষ্ট্রে এরূপও বিধান দেখা যায় যে, উভয় সভার কয়েকজন সমসংখ্যক সভ্যকে লইয়া একটি বৈঠক বসে, সেই বৈঠকে আপোষে একটা মীমাংসা হইয়া যায়। ইংলণ্ডে ও মার্কিনে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রাভাস অষ্ট্রেলিয়ায় নিয়ম আছে যে, কোন একটি বিশেষ প্রস্তাব লইয়া যদি বারবার উভয় সভার মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধ ঘটিতে থাকে, তাহাহইলে প্রধান শাসনকর্ত্তা উভয় সভা একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রজাদিগকে নবসভ্য-নির্ব্বাচনের অবসর দেন। নবনির্ব্বাচনের ফলেও যদি অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহাহইলে তিনি উভয় সভার সভ্যদিগকে এক বৈঠকে বসাইয়া তাঁহাদের সকলের মতামত গ্রহণ করেন এবং এই বৈঠকে অধিকাংশের যাহা মত হয়, তাহাই গ্রাহ্য করিয়া লন।

---

(১০)

শাসনচক্র।

রাষ্ট্রের শাসন ও পরিচালন ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের সমবায়কেই শাসনচক্র বলে। রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক এবং মন্ত্রিবর্গ—এই লইয়াই শাসনচক্র। শাসনচক্র শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানীয়। বিচার ও ব্যবস্থাপক

বিভাগের কর্ম্মচারীরা ব্যতীত অপর যাবতীয় রাজকর্ম্মচারীই শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত, এমন কি পোষ্টমাষ্টারটি পর্য্যন্ত।

ব্যবস্থাপক বিভাগে যেমন বহু লোকের সহযোগিতা প্রার্থনীয়, শাসনবিভাগে কিন্তু যত অল্প সংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা থাকে ততই বাঞ্ছনীয় বলিয়াই পণ্ডিতদের মত। নাপলেয়ঁ বলিতেন—'দুইজন যোগ্য সেনাপতি অপেক্ষা একজন অযোগ্য সেনাপতিও ভাল।' তাঁহার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই-যে, যুদ্ধকার্য্যে মতানৈক্য লইয়া ঝগড়া করিবার অবসর নাই, সেখানে তাড়াতাড়ি একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হয় এবং সেই মীমাংসা-অনুয়ায়ী কাযে লাগিয়া যাইতে হয়। শাসনবিভাগ সম্বন্ধেও সেই কথা। এখানেও কি করিতে হইবে তাহা তাড়াতাড়ি ঠিক্ করিয়া লইয়া একমনে দৃঢ়তার সহিত তাহাতে লাগিয়া যাইবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। এইজন্যই কোন সভ্যদেশেই শাসনচক্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যার আধিক্য নাই, আবার যাঁহারা শাসনচক্রের অন্তর্ভুক্ত আছেন তাঁহারাও স্থলবিশেষে একজনের নিদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকেন। মার্কিন-শাসনচক্রের সর্ব্বেসর্ব্বা তথাকার রাষ্ট্রনায়ক; মন্ত্রিরা তাঁহার অধীন-কর্ম্মচারী মাত্র; তিনিই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবারও অধিকার তাঁহার। তিনি আবার তথাকার সেনানায়কও বটেন। একাধারে রাষ্ট্রনায়ক ও সেনানায়ক হওয়ায় যুদ্ধের সময় তাঁহার ক্ষমতা রাষ্ট্রের মধ্যে অপ্রতিহত; তখন তিনি একাই সমস্ত বিষয় স্থির করিয়া লইয়া কায করিতে পারেন। গ্রেটবৃটেনের শাসনচক্রের নেতা প্রধান মন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রিদিগকে তিনি সব সময় পরিচালনা করেন না বটে, তবে সকলে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়াই চলেন এবং সময়বিশেষে তাঁহার মতানুসারেই চলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে কোন কোন রাষ্ট্রে এই নেতৃত্ব একাধিক লোকের উপর অর্পিত

হইত। কিন্তু তাহাতে কার্য্যে অসুবিধা ঘটিত বলিয়াই ঐতিহাসিকদের ধারণা। বর্ত্তমানে সুইজর্লণ্ডের শাসনচক্র পরিচালনা করেন—সাতজন ব্যক্তি। এই সাতজন সাতটি বিভাগের নেতা। যিনি যে বিভাগের নেতা, তিনি সেই বিভাগেরই সর্ব্বময় কর্ত্তা। প্রতি বৎসর তাঁহাদের মধ্য হইতেই একজন রাষ্ট্রনায়ক হন বটে, তবে সে রাষ্ট্রনায়কত্ব নামেমাত্র। ফ্রান্সেও যিনি রাষ্ট্রনায়ক, তিনিও নামেমাত্র রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান মন্ত্রিই কার্য্যত সর্ব্বেসর্ব্বা। গ্রেটবৃটেনেও রাজা কার্য্যত কোনরূপ নেতৃত্বই করেন না, প্রধান মন্ত্রির পরামর্শমতই চলিয়া থাকেন। প্রুসিয়ার রাজা বা জর্ম্মন সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা কিন্তু কার্য্যত রাষ্ট্রনায়কত্ব করিতেন, তাঁহারা নিজেরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন। মন্ত্রিরা তাঁহাদের ভৃত্যমাত্র ছিলেন।

এই রাজা বা রাষ্ট্রনায়কেরা কোথাও বংশানুগতভাবে রাষ্ট্রনায়কত্ব প্রাপ্ত হন আর কোথাও বা তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাচিত হন। গ্রেটবৃটেনের রাজা বংশানুগত; ফ্রান্স বা মার্কিনের রাষ্ট্রনায়ক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাচিত হন। ইংলণ্ডেও একদিন—যখন দেশে যোদ্ধৃ-রাজার আবশ্যক ছিল—তখন রাজবংশ হইতে কোন একজন শক্তিমান্ ও যোগ্য ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের জন্য রাষ্ট্রনায়কত্ব প্রদান করা হইত।

রাষ্ট্রনায়কত্ব বংশানুগত হওয়া সঙ্গত কি না সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। কোন মতে, বংশানুগত হওয়ায় অযোগ্য ব্যক্তিও রাষ্ট্রনায়কত্ব লাভ করিয়া রাষ্ট্রের মর্য্যাদার লাঘব করিতে পারে। অন্যমতে, বংশানুগত রাজা অযোগ্য হইলেও রাষ্ট্রের কার্য্য-ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং রাষ্ট্রও দৃঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় আর মনোমত নায়ক নিযুক্ত করিবার উত্তেজনায় বিপ্লব ঘটাইবার অবকাশও কেহ পায় না।

নির্ব্বাচন-প্রথার পক্ষে প্রধান যুক্তি এই-যে, তাহাতে যথার্থ যোগ্য

ব্যক্তি যিনি, তাঁহার রাষ্ট্রনায়কত্ব প্রাপ্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেরূপ রাষ্ট্রনায়কের অধীনে রাষ্ট্রে মঙ্গলই অধিকতর সম্ভবপর। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি এই-যে, যিনি রাষ্ট্রনায়কত্বে নির্ব্বাচিত হন, তিনি যে সর্ব্বথা প্রকৃত নায়কত্ব করেন, তাহা নয়, কোন-কোন স্থলে তো প্রধান মন্ত্রির কার্য্য সমর্থন করাই তাঁহার কায হয়।

তথাপি আজকাল সকলে, গণতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী হইয়া উঠায়, ক্রমশ নির্ব্বাচন-প্রথাকেই অনুকূল চক্ষে দেখিতেছেন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান রাষ্ট্রগুলির শাসনচক্রের প্রকৃতি একরূপ নয়। কোথাও তাঁহারা পার্লিমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য, কোথাও নন। যেখানে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকেন, সেখানে তাঁহাদিগকে পার্লিমেণ্টের মতামত মানিয়াই চলিতে হয়, অর্থাৎ পার্লিমেণ্টকে যতক্ষণ স্বপক্ষে রাখিতে পারেন, ততক্ষণই তাঁহাদের শাসনকর্ত্তৃত্ব আর যে-মুহূর্ত্তে তাঁহারা পার্লিমেণ্টের পৃষ্টপোষকতা হারান, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এই নিয়ম। যেখানে শাসনচক্র পার্লিমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়, সেখানে মন্ত্রিরা কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কের মতানুসারে চলিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের শাসন কর্ত্তৃত্ব সেই রাষ্ট্রনায়কের ইচ্ছানুসারে যে-কোন মুহূর্ত্তে শেষ হইয়া যাইতে পারে। প্রুসিয়াতে এই নিয়ম ছিল। মার্কিনেও এই নিয়ম। তবে এরূপ রাষ্ট্রের পার্লিমেণ্ট যদি একান্তই মন্ত্রিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে চান, তাহাহইলে মন্ত্রিদিগের কোন বিশেষ ত্রুটি ধরিয়া তাঁহাদের নামে অভিযোগ আনিয়া সেই ত্রুটি প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা ঘটে; সেনেটও নিবারণী শক্তির বলে রাষ্ট্রনায়কের দুই একটি কায নাকচ করিয়া দিতে পারেন; যথা মন্ত্রিনিয়োগ ও পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি সংস্থাপন ব্যাপারে।

গোড়ায় ইংলণ্ডেও মন্ত্রিরা রাজার ভৃত্য মাত্র ছিলেন এবং রাজার

মন যোগাইয়া চলিতে বাধ্য থাকিতেন, ষ্টুয়ার্টদের পতনের পর তৃতীয় উইলিয়ম আর্ল অব সাণ্ডার্লণ্ডের পরামর্শ মত পার্লিমেণ্টের প্রবল পক্ষ হইতে মন্ত্রি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতেই অতি ধীরে ধীরে মন্ত্রিরা ক্রমশ রাজার শাসনাধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করেন এবং একমাত্র পার্লিমেণ্টের নিকটই সকল কার্যোর জন্য দায়ী থাকিতে বাধ্য হন। এই পরিবর্ত্তন এত আস্তে আস্তে চলিয়াছিল যে, তৃতীয় জর্জ্জের আমলেও মন্ত্রিরা রাজার মন যোগাইয়া চলিতেন এবং পার্লিমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা হারাইলেও পদত্যাগ করিতেন না। সেই সময় লর্ড রকিম্‌হামই প্রথম স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেন। এই স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয় তখনই, যখনই মন্ত্রিরা চতুর্থ জর্জ্জকে পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে কোন মতামত জানাইতে অস্বীকৃত হন। তখন হইতেই মন্ত্রিসভা যথার্থভাবে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন এবং নিজেরা একটি সংঙ্ঘগত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

এই-যে কোন প্রবল পক্ষ হইতে মন্ত্রিনিয়োগ করিবার প্রথা তৃতীয় উইলিয়মের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহা যে সর্ব্বথা সুপ্রথা, তাহা নয়। যে-রাষ্ট্রে মাত্র দুইটি প্রবল দল থাকে, সেই রাষ্ট্রেই এই প্রথামত কায চলা সম্ভবপর হয়; কিন্তু ফ্রান্স বা ইতালীর মত রাষ্ট্রে যেখানকার পার্লিমেণ্টে দুইটি নয়—ততোধিক প্রবল দল দেখা যায়, সেখানে এই প্রথামত মন্ত্রিনির্ব্বাচন করিবার উপায় নাই। সেখানে অনেক সময়ই শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য রাষ্ট্রের বিশিষ্ট আদর্শকেও জলাঞ্জলি দিবার যথেষ্ট প্রলোভন আছে। সেখানে স্বার্থের খাতিরে অস্থায়ী কালের জন্য দুই তিনটি দলের সম্মিলন ঘটে। ইংলণ্ডে ক্রমশ দুইটি স্থলে বহুতর প্রবল পক্ষ ক্রমশ দেখা দিতেছে এবং বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা করিয়া সম্মিলিত দল গড়িবার ও রাষ্ট্রচক্রত্ব লইবার চেষ্টা দেখা

যাইতেছে। এই সম্মিলন ততক্ষণই স্থায়ী হয়, যতক্ষণ বিভিন্ন দল হইতে গৃহীত মন্ত্রিরা একজন প্রধানের নির্দেশ মানিয়া চলিতে কোন বাধা অনুভব করেন না।

যাহাহউক, শাসনচক্র যেখানে পার্লিমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য, সেখানে বিপ্লব ব্যতিরেকেই প্রজাতন্ত্রশাসনব্যবস্থা প্রচলন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে, অথচ রাজাকে বা রাষ্ট্রনায়ককে বিদূরীত করিবার কোন আবশ্যকতা থাকেনা। রাষ্ট্রনায়কত্বের প্রকৃত ক্ষমতা প্রজাপ্রতিনিধিদের হাতে থাকিবে—এই সর্ত্তে সম্মত হওয়াতেই সার্ডিনিয়ার রাজাকে সমগ্র ইতালী যুক্ত-ইতালীর রাজা বলিয়া মানিয়া লয়। রাজতন্ত্র ও যথেচ্ছারতন্ত্র প্রভৃতিকে ক্রমশ গণতন্ত্রে পরিণত করিবার সহজ উপায়ই হইতেছে শাসনচক্রকে পার্লিমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করা।

রাষ্ট্রনায়ক ও মন্ত্রিদিগকে লইয়া শাসনচক্র গঠিত হইলেও শাসনবিভাগে বহুলোকের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। এই সকল সহযোগিদিগকে রাজকর্ম্মচারী বলে। রাজকর্ম্মচারীরা যেখানে রাজনৈতিক মতামত-নিরপেক্ষ হইয়া স্থায়ীভাবে রাজকার্য্য করিয়া যাইতে পারেন, সেইখানেই শাসনবিভাগের কার্য্য ভাল চলে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বহু অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর হয়। যাঁহারাই শাসনচক্রের কর্ত্তা হইবেন, তাঁহারাই যদি পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া নিজেদের মনোমত ও দলভুক্ত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিতে থাকেন, তাহাহইলে শাসনবিভাগে লুটের ব্যবসায়ই প্রবর্ত্তন করা হয়। যাঁহারা শাসনচক্রের ভিতরের লোক নন, তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। যিনি পোষ্টমাষ্টার বা শিক্ষক বা চৌকীদার তাঁহাকে একটা বাঁধাধরা কায করিয়াই যাইতে হয়, মন্ত্রিদের সহিত তাঁহাদের রাজনৈতিক মতবৈষম্যের জন্য কার্য্যগত কোন অসুবিধায় পড়িবার কথা নয়। সুতরাং ঐরূপ

কর্ম্মচারীদিগকে স্থায়ীভাবে কার্য্যে নিয়োগ রাখাই রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গল; কারণ, সেইরূপ ব্যবস্থায় সৎ ও যোগ্য লোকও পাওয়া যায় আর অনর্থক কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তনের ফলে শাসনবিভাগে বিশৃঙ্খলাও ঘটে না। এই কর্ম্মচারী নিয়োগের শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে—প্রতিযোগী পরীক্ষা। পরীক্ষায় যাঁহারা যথার্থ উপযুক্ততার পরিচয় দিবেন, এমন সব ব্যক্তিকেই রাজকার্য্যে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া পণ্ডিতদের মত। তবে অবশ্য যে সব কর্ম্মচারীর রাজনৈতিক মতামতের সহিত মন্ত্রিদের রাজনৈতিক মতামতের কার্য্যগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এমন সব কয়েকজন কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা আছে। মার্কিন ক্রমশ এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে।

কর্ম্মচারী দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালনের এই যে প্রথা, এই প্রথাকে ইংরেজীতে বুরোক্রেসি ও বাঙ্গলায় আমলাতন্ত্র ব্যবস্থা বলে। কর্ম্মচারীরা যদি রাষ্ট্রবাসী হয়, তাহাহইলে তাহারা যে রাষ্ট্রহিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শাসনকার্য্য পরিচালন করিবে, তাহা স্বাভাবিক। আবার একবিধ কার্য্যে বহুদিন লিপ্ত থাকায় তাহারা সেই প্রকার কার্য্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও পটুতা লাভ করে, ফলে বিপৎ বা সঙ্কটকালে তাহাদের সেই অভিজ্ঞতা ও পটুতা যথেষ্ট সুফলদায়ক হয়।

কিন্তু এ প্রথারও দোষ আছে। সেই দোষ এই, অনেক সময় কর্ম্মচারীরা রাষ্ট্রস্বার্থ ভুলিয়া যাইয়া কি করিয়া নিজেদের চাকরি বজায় থাকে সেই দিকে অধিক নজর দিয়া ফেলে এবং 'রুটিন' মাফিক কাজ করিবার দিকেই অধিক ঝোঁক দেখায়। সাধারণত তাহারা কেবল উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকায় প্রজাদের মতের দিকে শ্রদ্ধা দেখাইতে ভুলিয়া যায়।

আবার ইহাও ঠিক, কর্ম্মচারীরা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকায়, সাধারণ

রাষ্ট্রপ্রজারা রাষ্ট্রকার্য্যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভের বিশেষ কোন সুযোগ পায় না, ফলে তাহারা রাষ্ট্রকার্য্যের দিকে ক্রমশ অমনোযোগী ও উপেক্ষা-পরায়ণ হইয়া উঠে। এই দোষের একমাত্র প্রতিষেধ হইতেছে—স্থায়ী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী ভাবেও নূতন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা। যাহারা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইতে থাকিবে, তাহারা কয়েক বৎসর কায করিয়া অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সঞ্চয় করিয়া যাইবে। এই মিশ্র প্রথার লাভ এই, একদিকে যোগ্যপ্রজারা রাষ্ট্রবুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত থাকে, অন্যদিকে কর্ম্মচারীরা (বা আমলারা) প্রজাদের স্বার্থ ভুলিয়া যাইবার অবসর পায় না ; ফলে আমলাতন্ত্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষে পরিণামে হিতকর হইয়া থাকে।

---

(১১)

বিচারবিভাগ।

যে সকল বিধি-নিষেধ রাষ্ট্রের হিতকল্পে ব্যবস্থিত হইয়া আইন-মর্য্যাদা লাভ করে, সেই বিধিনিষেধগুলি অভিযুক্তদের মধ্যে কে প্রকৃতপক্ষে মানিতেছে-না-মানিতেছে তাহা স্থির করা বিচারবিভাগের কায। খুব ঠাণ্ডা মেজাজ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও লোভসংযম-ক্ষমতা ব্যতীত কেহই ভাল বিচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। বিচারক নির্ভীকহৃদয় হওয়া আবশ্যক, কাজেই যাহাকে-তাহাকে বিচারকের আসনে বসান চলে না এবং যতদিন বিচারক আইন ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, ততদিন অতিবার্দ্ধক্য বা কার্য্যক্ষমতার হ্রাস ব্যতীত অপর কোন অজুহাতেই তাঁহাকে বিচারাসন হইতে নামান উচিত নহে এবং তিনি যাহাতে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে পারেন, সেদিকে অপর বিভাগগুলির তীব্র

লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া কয়জন সাধুতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়?

গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র এই নীতি মানিয়া চলেন। প্রুসিয়াতেও এই নিয়ম ছিল। মার্কিনের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কিন্তু এ নিয়ম মানা হয় না, সেখানে রাষ্ট্রপ্রজারা একটি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিজেদের মনোমত ব্যক্তিদিগকে বিচারক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহাতে এই ফল হয় যে, ঠিক সুবিচার অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। বিচারকেরা নিজেদের আসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আইনের মর্য্যাদা অপেক্ষা লোকের মতামতের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিতে বসেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। যাহা আইন বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা বিচারকের থাকা উচিত নয়। আইনের সুপ্রয়োগই তাঁহার কায। তবে যেখানে আইন কোন স্পষ্ট কথা বলে নাই, সেখানে অবশ্য বিচারক নিজের ন্যায়বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অথবা সমরূপ অবস্থায় অপর-কোন বিচারক কিরূপ বিচার করিয়াছেন তাহা জানিয়া সঙ্গত হইলে তদনুসারেই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। এটুকু স্বাধীনতা গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্স উভয় রাষ্ট্রই তাঁহাকে দিয়াছে।

রাষ্ট্রাভাস বৃটিশ ভারতে দেওয়ানী শাসনবিভাগ সম্বন্ধে যাহাই হউক ফৌজদারী শাসনবিভাগটির কিন্তু স্বাধীনতা নাই। মার্কিনের বিভিন্ন রাষ্ট্রকের বিচারকেরা যেমন লোকমত মানিয়া চলেন, এখানকার ফৌজদারি শাসকেরাও তেমনি রাষ্ট্রচক্রের মতামত মানিয়া চলেন। ফলে ফৌজদারী শাসনবিভাগ হইতে সর্ব্বক্ষেত্রে সুশাসন পাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই ফৌজদারী শাসনবিভাগকে রাষ্ট্রচক্রের বা শাসন-বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভারতবাসিরা চিরকাল আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। যতদিন না উহা শাসনবিভাগের প্রভাব

হইতে মুক্তি পাইতেছে, ততদিন পুলিশের অত্যাচার নিরাকৃত হইবে না, পুলিশের অন্যায় প্রভাব থাকিয়াই যাইবে।

ব্যবস্থাপক বিভাগ ও শাসনবিভাগের সভ্য যাঁহারা, তাঁহারা কোন অপকার্য্যের জন্য শাসনবিভাগের নিকট দায়ী কি না এই বিষয় লইয়া সকল আইনবেত্তা একমত নহেন। মার্কিনে ও গ্রেটবৃটেনে একমাত্র রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক ব্যতীত অপর সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ অপকার্য্যের জন্য বিচারবিভাগের বিচার মানিয়া লইতে বাধ্য। ফ্রান্স প্রভৃতি য়ুরোপীয় রাষ্ট্রে কেবল সাধারণ প্রজা ও রাষ্ট্রপ্রজারাই বিচারবিভাগের আমলের মধ্যে। ব্যবস্থাপক বিভাগ ও শাসনবিভাগের সভ্যদের উপর বিচারবিভাগের কোন এক্তার নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা বিচার করিবার ভার—শাসন-আদালতের। শাসন-আদালতের আইনগুলিও সব পৃথক রকমের। শাসন-আদালতকে ইংরেজীতে এডমিনিষ্ট্রেটিভ কোর্ট বলে। ঐসব দেশে আদালত দ্বিবিধ—যথা (১) রাষ্ট্র-পরিচালন সংক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য শাসন-আদালত আর (২) অপর সকলের জন্য সাধারণ আদালত। সাধারণ আদালতগুলি বিচারবিভাগের অধীন। আর, শাসন-আদালতগুলি প্রধানত শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত।

শাসন-আদালতগুলির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই-যে, শাসন-আদালতে প্রজারা নিরপেক্ষ বিচার সব সময় পায় না; যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদের নিকটই বিচার; কাজেই রাষ্ট্রে অবিচারের একটা পথ খোলা রাখা হয়। অধিকন্তু ইহাতে রাষ্ট্রপরিচালন সংক্রান্ত ব্যক্তিরা কতকটা নিরঙ্কুশ হইয়া যাহা-তাহা করিতে সাহস পায়, তাহাদের দায়িত্ববোধ অনেকটা কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের স্বাধীনতাও কতকটা খর্ব্ব হইয়া যায়। কিন্তু সকলকেই—শাসক ও প্রজা নির্ব্বিশেষে সকলকেই যদি সাধারণ

বিচারালয়ের অধীন করা হয়, তাহাহইলে প্রজাদের স্বার্থহানি ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়, সুবিচার পাইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং শাসকেরাও সংযত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়, সঙ্গেসঙ্গে প্রজাদেরও মর্য্যাদাবুদ্ধি ক্রমশ ফুটিয়া উঠে। প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অতিসামান্য ভিক্ষুকটি পর্য্যন্ত সকলকেই যদি এক যায়গায় গিয়া বিচার লইতে হয়, তাহাহইলে রাষ্ট্র যে অনেক উপদ্রব ও অনাচার হইতে রক্ষা পায়, তাহা তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

গ্রেটবৃটেনে নিরঙ্কুশ অধিকার যদি কাহারও থাকে তো তাহা কেবল রাজা-লর্ডসভা-ও-প্রজাপ্রতিনিধিসভা-মিলিত পার্লিমেণ্টের, আর কাহারও নয়। এইরূপ পার্লিমেণ্টে যাহা বিধিবিদ্ধ হয় তাহা সর্ব্বজনমান্য, তাহা অমান্য করিবার বা নাকচ করিবার অধিকার বিচারবিভাগেরও নাই। কিন্তু কাউন্টি-সভার মতন অপর যে-কোন সভা বা সঙ্ঘের মতকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা বিচারবিভাগের আছে। আরও, আইনে যাহাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছে, সে যদি সেই ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কায করে, তাহাহইলে তাহাকে সেজন্য বিচারালয়ের নিকট দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই দণ্ডের হাত হইতে অপর সব রাজকর্ম্মচারীর কথা দূরে থাক প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত বাদ যান না।

মার্কিনেও সেই নিয়ম। তবে সেখানে কংগ্রেসের ক্ষমতা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত থাকায় কংগ্রেসে-বিধিবদ্ধ আইনের ন্যায্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা বিচারবিভাগের আছে। বিচারবিভাগ অবশ্য কোন অন্যায্য আইনকে স্পষ্টত নাকচ বা বাতিল করিতে পারেন না, তবে তাহার প্রয়োগ রোধ করিতে পারেন। ফলে কার্য্যত তাহা নাকচই হইয়া যায়। কংগ্রেসের বিধিবদ্ধ আইনকে অন্যায্য বলিয়া ঘোষণা করিবার যে অধিকার মার্কিনবিচারবিভাগের আছে, তাহা সমর্থনযোগ্য কিঁনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ

আছে। যেখানে রাষ্ট্র এককেন্দ্রিক নয়– বহুকেন্দ্রিক অথবা যেখানে রাষ্ট্র কতকগুলি ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রকের সম্মিলন-ফল, সেইখানে মার্কিনী প্রথার মূল্য আছে। কিন্তু ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রে—যেখানে রাষ্ট্র এককেন্দ্রিক এবং রাষ্ট্রপ্রজারা সকলেই একরাষ্ট্রভুক্ত, বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকের প্রজা নয়, সেখানে মার্কিনী প্রথার প্রয়োগ সমীচীন নয়, সেখানে পার্লিমেণ্টের (কংগ্রেসের বা জাতীয় সংসদের) বিধিবদ্ধ আইন অকাট্য বলিয়াই মানিয়া লওয়া বিচারবিভাগের কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। নহিলে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত হিত ব্যাহত হইতে পারে। তাছাড়া, এইরূপ সব রাষ্ট্রে পার্লিমেণ্টই তো সর্ব্বেসর্ব্বা।

---

(১২)

সম্মিলিতরাষ্ট্র।

আত্মরক্ষার বা শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই এপর্য্যন্ত ক্রমশ বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রাংশকে গ্রাস করিতে সমুৎসুক হইয়া আসিয়াছে। এই গ্রাস-চেষ্টার ফলে পৃথিবীতে বহু নররক্তস্রোত বহিয়াছে ও বহিতেছে। এই নররক্তপাত ব্যতীত আরও একটি উপায়ে রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধিসাধন কোথাও কোথাও সম্ভবপর হইয়াছে। সে-উপায় হইতেছে মিলনের আবশ্যকতা বুঝিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের আপনাহইতে সম্মিলিত হওয়া। এরূপ সম্মিলনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বহু দেখা যায়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ড মিলিত হইয়া এক-রাষ্ট্রত্ব লাভ করে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মার্কিনের কতকগুলি রাষ্ট্র একত্র হইয়া সম্মিলিতরাষ্ট্রের পত্তন করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর জর্ম্মনীর রাষ্ট্রগুলি এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জর্ম্মনীর রাষ্ট্রগুলি ঐরূপ

মিলিত হইয়া জর্ম্মনসাম্রাজ্যের সৃষ্টি ঘটায়। ইতালীও গোড়ায় এইরূপ সম্মিলিতরাষ্ট্র। প্রাচীন কালেও এইরূপ সম্মিলিতরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট ছিল।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মিলনের ফলে প্রধানত তিন প্রকার রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। প্রথম একরাষ্ট্র (যেমন, বর্ত্তমান গ্রেটবৃটেন ও বর্ত্তমান ইতালী); এইরূপ রাষ্ট্রে একটি মাত্র শাসনচক্র ও পার্লিমেণ্ট থাকে, তাহাই সমগ্র রাষ্ট্রের পরিচালক। দ্বিতীয়, সম্মিলিত রাষ্ট্র (যেমন মার্কিন ও সুইজর্লণ্ড); এইরূপ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্য একেবারে লোপ পায় না, সে সব রাষ্ট্র কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে একতাবিশিষ্ট, আর যাবতীয় স্থানীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ভিন্নপন্থী; কিন্তু স্থানীয় ব্যাপার সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্নপন্থী হইয়াও রাষ্ট্রগুলি পররাষ্ট্রসম্পর্কে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং সম্মিলিতরাষ্ট্রেরই অঙ্গীভূত বলিয়া নিজেদিগকে প্রচার করে; এইরূপ অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে রাষ্ট্র না বলিয়া রাষ্ট্রক বলাই সঙ্গত; কারণ, রাষ্ট্রক-গুলির রাষ্ট্রপ্রভুত্ব সম্মিলিতরাষ্ট্রত্ব লাভ করায় উহারা প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। তৃতীয়, রাষ্ট্রগুচ্ছ (যথা বিগত যুদ্ধকালের মিত্রশক্তি, মধ্যশক্তি ইত্যাদি বা বর্ত্তমান সময়ের রাষ্ট্রসংঘ); এইরূপ রাষ্ট্রগুচ্ছ প্রকৃত পক্ষে একটি সাময়িক কাজেই ক্ষণিক ব্যবস্থা মাত্র; রাষ্ট্রগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির কেহই নিজের রাষ্ট্রপ্রভুত্ব ত্যাগ করে না এবং সর্ব্বকার্য্যেই স্বয়ংপ্রধান থাকে, তবে কোন বিশিষ্ট স্বার্থসিদ্ধির জন্য কার্য্য বিশেষ সম্বন্ধে একমত হইয়া চলে এই মাত্র; স্বার্থসিদ্ধ হইলে রাষ্ট্রগুচ্ছের রাষ্ট্র-গুচ্ছত্ব লোপ পাইতে পারে এবং গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি নূতন নূতন গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হইতেও পারে। অথবা আবার আবশ্যকমত নূতন নূতন গুচ্ছ গড়িয়া তুলিতে পারে। যে সকল রাষ্ট্রের মিলনে একরাষ্ট্র বা সম্মিলিতরাষ্ট্র গঠিত হয়, সে-সব রাষ্ট্রের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যলাভের বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের কোন অধিকার থাকে না।

সম্মিলিতরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রকগুলির এইরূপ স্বাধীনতা আছে কি না, ইহা লইয়া একবার মার্কিনে ঘোরদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। দক্ষিণ রাষ্ট্রকগুলি বলে যে উহাদের সে অধিকার আছে আর উত্তর রাষ্ট্রকগুলি বলে যে উহাদের সে অধিকার নাই। দক্ষিণ রাষ্ট্রকগুলি সে-অধিকার দাবী করে এবং আলাদা হইয়া নূতন সম্মিলিতরাষ্ট্রের গঠন করিতে প্রয়াস পায়; উত্তর রাষ্ট্রকগুলি কিন্তু দক্ষিণরাষ্ট্রকগুলির সেরূপ স্বাতন্ত্র্যের অধিকার অস্বীকার করিয়া তাহাতে বাধা দেয়। ফলে যুদ্ধ ঘটে। সুইজর্লণ্ডেও একবার অস্ত্রযোগে এই অধিকারসমস্যার মীমাংসা হয়। এখন স্থির হইয়াছে, রাষ্ট্রকগুলির স্বাতন্ত্র্যলাভের বা স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশের কোন অধিকার নাই।

যেখানে একরাষ্ট্রত্ব ঘটে, সেখানে তো পূর্ব্বেকার রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্বই এককালে লোপ পায়। যাহা লোপ পাইয়াছে, যাহার স্বতন্ত্র অস্থিত্বই নাই, তাহা আবার স্বাতন্ত্র্য পাইবে কেমন করিয়া? তাহার স্বাতন্ত্র্যবিধান বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দান করিবার অধিকার আছে একরাষ্ট্রের একমাত্র পার্লিমেণ্টের, আর কাহারও নাই। এইজন্যই আয়র্লণ্ড স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য গ্রেটবৃটেনের পার্লিমেণ্টের দ্বারে এতদিন ধরিয়া মাথা খুঁড়িয়া আসিতেছে।

অস্ত্রের জোরে যদি কেহ স্বতন্ত্র হয়, সে আলাদা কথা। সেটা আইনের কথা নয়। আইন মানিতে হইলে আয়র্লণ্ডকে বা সম্মিলিত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন রাষ্ট্রককে যে যাহার অন্তর্ভুক্ত তাহার নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইবে। এইরূপ যাচ্ঞারই নাম বৈধ আন্দোলন। অস্ত্রের জোরে স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টাকে বিদ্রোহ বলে।

সম্মিলিতরাষ্ট্রের হাতে এমন সব কার্য্যের ভার থাকা উচিত, যাহা সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে সাধারণ বা সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর। যথা—

(১) যুদ্ধ ঘোষণা ও পরিচালনা;

(২) পররাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা;

(৩) সারা রাষ্ট্রের হিতার্থ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কর নির্দ্ধারণ বা অন্য কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ ও উহার ব্যয়।

এই কাযগুলি সর্ব্বপ্রধান কায। এইগুলি ছাড়াও উহার হাতে নিম্নোক্ত কাযগুলি থাকা ভাল। যথা—

(ক) মুদ্রা প্রস্তুত কার্য্য;

(খ) পেটেণ্ট ও কপিরাইট সম্বন্ধে বিধিনিষেধ স্থিরিকরণ কার্য্য;

(গ) ডাক ও তার বিভাগের কার্য্য।

এই কার্য্যগুলি দ্বারা সম্মিলিতরাষ্ট্র সারা রাষ্ট্রে একবিধ মুদ্রার প্রচলন করিয়া, চিঠিপত্রের বিলিবন্দোবস্তের একটি সাধারণ নিয়ম রাখিয়া সাধারণের যেমন উপকার করেন, তেমনি পেটেণ্ট ও কপিরাইট সম্বন্ধে একটি সাধারণ বিধিনিষেধ বিধিবদ্ধ করিয়া সারা রাষ্ট্রবাসীকে নূতন উদ্ভাবনাকার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারেন।

সারা রাষ্ট্রে যাতায়াত ও বাণিজ্য সুগম করিবার জন্য উহার হাতে

(১) রেল-রাস্তা পরিচালনার বা তত্ত্বাবধানের

(২) খাল কাটানোর এবং

(৩) শুল্ক নির্দ্ধারণের ভার থাকাও উচিত।

বিভিন্ন রাষ্ট্রকের হাতে শুল্কনির্দ্ধারণের ভার থাকিলে একই দ্রব্যের জন্য হয় বহুবার আয় নয় বিভিন্ন রাষ্ট্রকমধ্যে বিভিন্ন প্রকার শুল্ক দিতে হয়, তাহাতে বাণিজ্যের যথেষ্ট অসুবিধা অনিবার্য্য। যদি সারা রাষ্ট্রের জন্য একবিধ শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়, তাহাহইলে বণিকেরা অনেক অকারণ অসুবিধা হইতে রক্ষা পায়।

রাষ্ট্রবাসিদের শিক্ষাবিধানের ভার ও মাদকদ্রব্যসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ভার বিভিন্ন রাষ্ট্রকের হাতে থাকা ভাল কি না সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

জনসাধারণের হিতার্থ অর্থসাহায্য করিবার অধিকার সম্বন্ধেও সেইরূপ মতদ্বৈধ দেখা যায়।

আমাদের দেশে বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ সম্বন্ধে কোন আইন রাজাকে বা রাষ্ট্রকে করিতে হয় না; তাহা পুরাপুরি ভাবেই সামাজিক ব্যাপার। রাষ্ট্র সামাজিক ব্যবস্থামাত্র মানিয়া চলেন (যদিও এখনকার রাজা বা রাজপুরুষেরা কয়েকটি প্রচলিত বিধি অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে মানিয়া লইয়া সমাজের সে-অধিকার কথঞ্চিৎ পরিমাণে হরণ করিয়াছেন)। আমাদের দেশে যাহাই হউক, পশ্চিম দেশীয় রাষ্ট্রগুলিতে বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ সম্বন্ধীয় নূতন নূতন আইন প্রণয়নের ভার রাষ্ট্রকগুলির নিজেদের হাতে, না সম্মিলিতরাষ্ট্রের হাতে, কাহার হাতে থাকা উচিত, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

মার্কিনের রাষ্ট্রকগুলি মৌলিকবিধান দ্বারা এই কাযগুলি কংগ্রেসের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে; যথা—

(১) মার্কিনের নাম করিয়া টাকা ধার করা;

(২) পররাষ্ট্রগুলির সহিত এবং মার্কিনের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রকগুলির সহিত ও আদিম অধিবাসিদের সহিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করা;

(৩) সারা রাষ্ট্রমধ্যে যাহাতে একই নিয়মে পররাষ্ট্রগত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রপ্রজাত্ব লাভ করিতে পারে এবং যাহাতে সারা রাষ্ট্রে দেউলিয়াদের সম্বন্ধে একবিধ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে এজন্য যথাবিহিত আইন প্রণয়ন করা;

(৪) মুদ্রা তৈয়ারি করা, মুদ্রার দাম স্থির করা, বিদেশ হইতে আনীত মুদ্রার সহিত মার্কিনী মুদ্রার বিনিময়মূল্য স্থির করা এবং রাষ্ট্র মধ্যে একই রকম ওজন ও মাপ চালানো।

(৫) মার্কিনী মুদ্রা কিম্বা নোটের কেহ জাল করিলে তাহাকে শাস্তিদানের ব্যবস্থাকরা ;

(৬) ডাকঘর বসানো ও ডাকের রাস্তা তৈরি করা ;

(৭) কিছুকালের জন্য নূতন গ্রন্থ, রচনা, চিত্র ও উদ্ভাবনা প্রভৃতির কপিরাইট (বা প্রচলন স্বত্ব) গ্রন্থকার বা উদ্ভাবকদিগকে প্রদান করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের ও শিল্পের উন্নতিবিধানের চেষ্টাকরা ;

(৮) উচ্চতম আদালতের অধীন নানা আদালত স্থাপন করা ;

(৯) সমুদ্রে যাহারা জলদস্যুতা করে বা ঘোর বে-আইনী কায করে আর যাহারা রাষ্ট্র মধ্যে কোন অপরাধ করে, তাহাদিগকে শাস্তিদিবার ব্যবস্থা করা ;

(১০) যুদ্ধ ঘোষণা করা, শত্রুর দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের অধিকার কাহাকেও দেওয়া, জলে-স্থলে অধিকৃত শত্রুসম্পত্তি সম্বন্ধে নিয়ম প্রণালী স্থির করা ;

(১১) সৈন্য সংগ্রহ ও গঠন করা, এবং দুই বৎসর পর্য্যন্ত সৈন্য পোষণ করা ;

(১২) নৌবহর গঠন ও পোষণ করা;

(১৩) স্থলসৈন্য ও জলসৈন্যদের পরিচালন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধি নিষেধ স্থির করা ;

(১৪) সম্মিলিতরাষ্ট্রের আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, বিদ্রোহ ও উৎপাত দমন করিবার জন্য এরং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য রাষ্ট্রবাসিদিগকে লইয়া সৈন্যদল (প্রজাসৈন্য বা মিলিশিয়া) গঠনের ব্যবস্থা করিয়া রাখা ;

(১৫) প্রজাসৈন্য (বা মিলিশিয়া) গঠন করা, তাহাদিগকে সাজানো ও শিখানো সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা ; আর কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ অনুসারে পরিচালিত করিবার জন্য কতকগুলি সৈন্য রাষ্ট্রকগুলির হাতে

ছাড়িয়া দিয়া এবং সেই সৈন্যগুলির সেনাপতি প্রভৃতির নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রকদিগের স্বাধীনতায় হাত না দিয়া বাকি সৈন্য নিজের অধীনে পরিচালিত করা;

(১৬) রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী দশ মাইল পর্য্যন্ত স্থানের শাসনসংক্রান্ত এবং দুর্গ, অস্ত্রাগার, বারুদশালা, জাহাজঘাটা (বা ডকইয়ার্ড) বা ঐরূপ কোন আবশ্যক কার্য্যের জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক ক্রীত স্থানের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রণয়ন করা;

(১৭) এই সব বিভিন্ন অধিকার অনুযায়ী এবং মৌলিকবিধান প্রদত্ত আরও বহুবিধ অধিকার অনুযায়ী কায করিবার জন্য আবশ্যক যাবতীয় আইন প্রণয়ন করা।

এই সকল অধিকার ব্যতীত আরও অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধীয় অধিকার কংগ্রেস ক্রমশ বিচারবিভাগের ভাষ্যের কল্যাণে পাইয়াছে ও পাইতেছে। মার্কিনের জনৈক প্রধান বিচারপতির মত এই-যে, যে-সব অধিকার ও ক্ষমতা কংগ্রেসকে স্পষ্টত দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল ক্ষমতা ও অধিকার মত কায করিবার জন্য কংগ্রেসের যে সকল অনুসঙ্গী অধিকার ও ক্ষমতা আবশ্যক সে সকলও কংগ্রেসকে কার্য্যত দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ভাষ্যের ফলে কংগ্রেস স্পষ্ট অধিকার না থাকা সত্ত্বেও লুইসিয়ানা ক্রয় করে, টেকসাস রাষ্ট্রান্তর্ভুক্ত করে, রেলরাস্তা, খাল, কৃষি-বিদ্যালয় প্রভৃতির জন্য জমি দখল করে, নোট বাহির করে, ডাকখানা সম্বন্ধীয় কায একচেটিয়া করে, ব্যাঙ্কগুলি নিজের আয়ত্তে আনে এবং এইরূপ আরও অনেক কায করে; আবার আবশ্যক হইলে এইরূপ অনেক কায ভবিষ্যতে করিবেও। মৌলিকবিধানকে অতিরিক্ত কড়া করিতে গিয়া মার্কিনীরা যে ভুল করিয়াছিল, বিচারবিভাগের হাতে এইরূপ ভাষ্যের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া সেই ভুলের অহিতকর ফল হইতে

তাহারা নিজেদিগকে অনেকটা বাঁচাইয়াছে। এইরূপ ভাষ্য করিবার অধিকার বিচারবিভাগের না থাকিলে মার্কিনের পক্ষে কোন নূতন কার্য্য করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিত।

---

(১৩)
উপনিবেশ।

উপনিবেশগুলির উৎপত্তির যে যে কারণ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহা এই—(১) যুদ্ধজয়, (২) যুদ্ধের খেসারৎ স্বরূপ প্রাপ্তি, (৩) অর্থদিয়া ক্রয়, আর (৪) জনশূন্য প্রান্তরে গিয়া বসবাস। প্রথমটির দৃষ্টান্ত স্পেনের জয়-করা মেক্সিকো ও পেরু এবং ইংরেজের জয়-করা কানাডা। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত স্পেনের নিকট হইতে মার্কিনের খেসারৎ-পাওয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। তৃতীয়টির দৃষ্টান্ত মার্কিনের কেনা লুইসিয়ানা। আর চতুর্থটির দৃষ্টান্ত আমেরিকার ও আফ্রিকার প্রান্তরে য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের নবনবরাজ্য গঠন; যথা, মার্কিন, নেটাল, কেপকলোনী প্রভৃতি। চতুর্থ প্রথা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যে-রাষ্ট্রের প্রজারা যে-প্রান্তর প্রথম আবিষ্কার করিবে বা তথায় গিয়া বাস করিবে, সেই প্রান্তর সেই রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত রাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে। অসভ্যজাতিদের অধ্যুষিত দেশ জনশূন্য প্রান্তর বলিয়াই গণ্য হয়। কোন দেশবিশেষে অসভ্যদের কোন অধিকার যে থাকিতে পারে, ইহা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রপণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের ভাব অনেকটা এইরূপ—'জোর যার মুলুক তার'।

পূর্ব্বে উপনিবেশগুলি সর্ব্বতোভাবেই অধীনরাজ্যমাত্র ছিল। উহাদের কোন কার্য্যেই স্বাধীনতা ছিল না। যে-রাষ্ট্রের যে-উপনিবেশ, সেই রাষ্ট্র

নিজের ইচ্ছামত সেই উপনিবেশের শাসন পরিচালন করিতেন এবং সেই উপনিবেশকে নিজের সুখ-সম্পদবৃদ্ধির উপায় মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। তবে, মার্কিন বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজের শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে, রাষ্ট্রবাসিদের মধ্যে এই বোধ জন্মিতে থাকে যে, উপনিবেশগুলির অন্তঃশাসনে স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক। এই আবশ্যকতাবোধ হইতেই বিভিন্ন উপনিবেশে বিভিন্ন প্রকার শাসনব্যবস্থার প্রচলন হইতেছে। কোথাও অন্তঃশাসন নামেমাত্র স্বাধীন, আর কোথাও রাষ্ট্রের সহিত উপনিবেশের অতি সূক্ষ্ম সূত্রের যোগমাত্র আছে।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রথা বর্ত্তমান কালের কোন জাতির নবাবিষ্কার নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আর্য্যেরা ভারতের বাহির হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। গ্রীক ও ফিনিকেরা ভূমধ্যসাগরের তীরদেশে কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। রোমীয়েরাও উপনিবেশ স্থাপনে কম পটু ছিল না। আমেরিকাতে ও প্রাচ্যখণ্ডে আসিবার পথ আবিষ্কার হইবামাত্র য়ুরোপীয়দের মধ্যে উপনিবেশস্থাপনের যে ধুম পড়িয়া যায়, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। আফ্রিকা লইয়া এখনও তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে।

উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন যে দিতেই হইবে, এমন কোন বিধান আজ পর্য্যন্ত কোন রাষ্ট্র মানিয়া লয় নাই, বৃটিশেরাও নয়। বৃটিশদের ঔপনিবেশিক নীতি কিরূপ, তাহা আর্ল গ্রের উক্তি হইতে বুঝা যায়। আর্ল বলেন—যে সকল উপনিবেশের অধিবাসীরা বাস্তবিকই সভ্য এবং আত্মশাসনের উপযুক্ত, কেবল তাহাদিগকেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া চলে; আর যাহারা সেরূপ সভ্য বা উপযুক্ত নয়, যাহারা

আত্মশাসনকার্য্যে অজ্ঞ ও অক্ষম, তাহাদিগকে সুশাসনের অধীনে রাখাই আবশ্যক। অর্থাৎ প্রত্যেক উপনিবেশের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের মত। ফলে কানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি যে সকল উপনিবেশে সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গদের প্রভাব বেশী, কেবল সেই সব উপনিবেশ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পাইয়াছে; আর অপরগুলিতে নানারকমের শাসনপদ্ধতি দেখা যায়। তবে সকল উপনিবেশকেই বৃটিশ রাজার আদেশ অল্পাধিক মানিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেকেরই উচ্চতম শাসনকর্ত্তা (কোথাও কার্য্যত আর কোথাও নাম মাত্র ভাবে) রাজাদ্বারা নিযুক্ত হন; উপনিবেশগুলি যে সকল আইন প্রণয়ন করে, সেগুলিকে নাকচ করিয়া দিবার অধিকার বৃটিশরাজার আছে। আর, সকল উপনিবেশের শেষ বিচারালয় ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারমণ্ডলী।

ইংরেজদের উপনিবেশগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—(১) ক্রাউনকলোনী বা রাজার প্রত্যক্ষাধীন উপনিবেশ; (২) ব্যবস্থাপকসভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকারপ্রাপ্ত উপনিবেশ; আর, (৩) স্বায়ত্তশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত উপনিবেশ। প্রথম শ্রেণীর উপনিবেশগুলিতে কোনরূপ স্বায়ত্তশাসন নাই। বিভিন্ন স্তরের আশ্রিতরাজ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ষ্টেটসেটলমেণ্ট, হঙ্কং, ফিজি, ত্রিনিদাদ, জিব্রালটার প্রভৃতি উপনিবেশ এই শ্রেণীভুক্ত। এইগুলির শাসনপদ্ধতি একরূপ নয়। ইহাদের শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন। শাসনকর্ত্তারা কোথাও (যেমন জিব্রাল্টারে) একেবারে প্রজাদের মতনিরপেক্ষ হইয়া শাসনকার্য্য চালান; আর কোথাও বা (যেখানে অনেক শ্বেতাঙ্গের বাস আছে, সেখানে) তাঁহারা প্রজাদের প্রতিনিধিদের মত মানিয়া চলেন। বৃটিশহণ্ডুরাসের শাসনপরিষদে

রাজ-মনোনীত পাঁচজন প্রতিনিধি আছে আর ব্যবস্থাপক সভায় তিনজন সরকারীকর্ম্মচারী ও রাজ-মনোনীত পাঁচজন প্রজা আছে। হঙ্কং-এর শাসনকার্য্যে কথা বলিবার অধিকার প্রজাদের আরও একটু বেশী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপনিবেশগুলিতে আংশিক স্বায়ত্তশাসন আছে, কারণ এগুলিতে প্রজাদের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। সিংহল, জামাইকা, ম্যুরিশস্, বহমাস্, বার্বাডোস্, বৃটিশগিয়ানা, বারমুডা প্রভৃতি এই শ্রেণীর উপনিবেশ। এই সকল উপনিবেশের শাসনপরিষদে যে সকল প্রজাপ্রতিনিধি স্থান পান, তাঁহারা সকলেই রাজার মনোনীত বা প্রজাদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি নন। ইহাদের কোনটিতে একটি মাত্র পরিষৎ আছে, সেখানে রাজমনোনীত ও প্রজানির্ব্বাচিত উভয় প্রকার প্রতিনিধিরাই স্থান পান (যেমন ম্যুরিশস্ ও জামাইকাতে)। কোনটিতে বা পার্লিমেণ্টের অনুরূপ দুইটি পরিষৎ আছে। একটিতে রাজমনোনীত প্রতিনিধিরা আর অপরটিতে প্রজানির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা বসেন। বার্বাডোসে এই নিয়ম। তবে সর্ব্বত্রই প্রজানির্ব্বাচিত প্রতি-নিধিদের অপেক্ষা রাজমনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা অধিক রাখা হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। ইহাদের শাসনব্যবস্থার আদর্শ বৃটিশদ্বীপ। কানাডা নিউজিলণ্ড প্রভৃতি এইরূপ উপনিবেশ। এগুলি কার্য্যত স্বাধীন রাজ্য বিশেষ। বৃটিশ পার্লিমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া ইহাদের শাসনপদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিবার, উপনিবেশের প্রণীত আইন নাকচ করিবার এবং প্রিভিকাউন্সিলের বিচারমণ্ডলীকে শেষবিচারকরূপে মানিয়া চলিতে বাধ্য করিবার অধিকার বৃটিশ মন্ত্রিসভার (বা কাবিনেটের) আছে। এই সকল অধিকারের প্রয়োগ ভিন্ন আর কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃটিশ মন্ত্রিসভা নিজেদের কর্ত্তৃত্ব দেখান না।

পক্ষান্তরে, বৃটিশ পার্লিমেণ্টের প্রভুত্ব অস্বীকার করিবার অধিকারও উপনিবেশগুলির নাই; সে-অধিকার প্রদানের একমাত্র কর্ত্তা বৃটিশ পার্লিমেণ্ট। বৃটিশ পার্লিমেণ্ট যে-উপনিবেশকে যতটুকু অধিকার দিয়াছেন, সেইটুকু অধিকার ভোগে সে নিরঙ্কুশ, উহার সে-অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা বা রাজা কাহারও নাই, সে-ক্ষমতা একমাত্র পার্লিমেণ্টেরই আছে। কানাডা একবার পার্লিমেণ্টের এই ক্ষমতাটুকুও অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তখন বিচারে স্থির হইয়াছিল, সেরূপ অস্বীকারের অধিকার কানাডার নাই, পার্লিমেণ্ট উহাকে সে-অধিকার দেয় নাই।

এই সকল উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃটিশ মন্ত্রিসভা কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করায়, নিজ উপনিবেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিবার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে উহারা সমর্থ। বাহির হইতে আমদানী-করা দ্রব্যের শুল্ক সম্বন্ধে উহারা যখন কোন ব্যবস্থা করে, তখন নিজের হিতাহিতের দিকে সম্পূর্ণভাবে নজর দিয়াই করিতে পারে, বৃটিশদ্বীপের বণিক বা শিল্পীদের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না। ১৯০৩ সালের পূর্ব্বে উহারা বৃটিশদ্বীপের দ্রব্যগুলিকেও বিদেশী দ্রব্য বলিয়া গণ্য করিত; বিদেশী দ্রব্যের উপর যে আমদানী শুল্ক ছিল, বিলাতী দ্রব্যের উপরও ঠিক সেই আমদানী শুল্ক ছিল। কিন্তু ঐ সাল হইতে স্থির হয় যে, বিলাতী দ্রব্যকে যে-হারে আমদানী শুল্ক দিতে হইবে, তাহা যেন অপর বিদেশী দ্রব্যের আমদানী শুল্কের হার হইতে পরিমাণে কম হয়। বিলাতী দ্রব্যের অনুকূলে প্রবর্ত্তিত এইরূপ ব্যবস্থাকে ইংরেজীতে "প্রেফারেন্‌শিয়াল রেট্ অব্ ডিউটি" বলে। বাঙ্গালায় উহাকে 'অনুগ্রহাত্মক শুল্কহার' বলা যাইতে পারে, বোধ হয়।

পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়ে উপনিবেশগুলির স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব নাই।

গ্রেটবৃটেন তাহাদের হইয়া অপরের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন প্রভৃতি কায করেন, তবে সে-সব কায ঔপনিবেশিক প্রজাদের মতামত জানিয়াই করেন, একেবারে যথেচ্ছাচারীভাবে করেন না। যে-উপনিবেশ সম্বন্ধে সন্ধি হয়, সেই উপনিবেশের কয়েকজনকে প্রতিনিধিরূপে সন্ধি-পরিষদের কার্য্যে যোগদিবার অধিকার দেওয়া হয়। সন্ধি-পরিষদে যাহা স্থির হয় তাহা ঔপনিবেশিক পার্লিমেণ্টের অনুমোদিত করিয়া লওয়া হয়। (মার্কিনে রাষ্ট্রদূত পাঠাইবার অধিকার কানাডা সম্প্রতি লাভ করিয়াছে বলিয়া যেন শুনিতেছি।)

এই উপনিবেশগুলির শাসনব্যবস্থা ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। ইহাদের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া পার্লিমেণ্ট আছে। সেই পার্লিমেণ্টে দুইটি করিয়া পরিষৎ আছে। লর্ডসভার অনুরূপ পরিষৎটিতে যাঁহারা বসেন, তাঁহারা কোথাও (যেমন, কানাডায়, নেটালে ও নিউজিলণ্ডে) ঔপনিবেশিক মন্ত্রিসভার মনোনীত ব্যক্তি আর কোথাও (যেমন, অষ্ট্রেলিয়া ও কেপকলোনীতে) প্রজাদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি। মন্ত্রিসভা যতদিন সাধারণ প্রজাপ্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সভ্যকে নিজমতে রাখিতে পারেন, ততদিনই তাঁহাদের আয়ুষ্কাল। মন্ত্রিসভার সহযোগিতায় প্রধান মন্ত্রী শাসনচক্র পরিচালনা করেন। ইংলণ্ডের রাজার মতন এখানকার শাসন-কর্ত্তাও নামেমাত্র কর্ত্তা। ঔপনিবেশিক মৌলিকবিধানগুলির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে-সব ব্যবস্থা আছে, তাহা অনেকটা মার্কিনের ব্যবস্থার অনুরূপ।

প্রত্যেক উপনিবেশ ক্রমশ একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠে, ইহাই আগেকার বৃটিশ রাষ্ট্রপণ্ডিতদের ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছারই অভিব্যক্তি স্বরূপে ক্রাউনকলোনী কানাডা রাজার প্রত্যক্ষাধীন শাসনের অবস্থা হইতে ক্রমশ স্বায়ত্তশাসনের অবস্থা পাইয়াছে। সম্প্রতি কিন্তু এইরূপ ইচ্ছার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সকল উপনিবেশগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া

একটি সাধারণ শাসনচক্রের অধীন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ চেষ্টা ও আদর্শের ইংরেজীনাম 'ইম্‌পিরিয়াল্‌ইজম্‌' (সার্ব্বভৌম ব্যবস্থা)।

এই প্রসঙ্গে বৃটিশ ভারতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃটিশ ভারত উপনিবেশ নয়, জমীদারী বিশেষ। ইহার রাষ্ট্রীয় অবস্থা ক্রাউন কলোনীগুলির অনুরূপ। ১৯২০ সালের পূর্ব্বে এখানকার শাসনব্যবস্থায় প্রজাদের কোন হাত ছিল না; কেবল ম্যুনিসিপাল ব্যাপারে তাহাদের যাহা কিছু প্রতিনিধিমূলক কর্ত্তৃত্ব ছিল। প্রজাদিগকে শাসনাধিকার দিবার পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও, রাজা তাঁহার সচিব ও কর্ম্মচারীবৃন্দের সাহায্যেই উহার যথেচ্ছশাসন করিয়া আসিয়াছেন, শাসনকার্য্যে প্রজাদের পরামর্শ লন নাই। ১৯২০ সাল হইতে ভারতের শাসনব্যাপারে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। পার্লিমেণ্ট ভারতবাসিকে কোন কোন বিষয়ে শাসনাধিকার দিয়াছেন এবং প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার অনুকূলে কতকটা ঝোঁক দেখাইয়াছেন। ভারতবাসিদের জাতীয় মহাসভা কিন্তু এইটুকু অধিকারলাভে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা চান তৃতীয় শ্রেণীর উপনিবেশগুলির মত সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং এইরূপ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকেই তাঁহারা স্বরাজ আখ্যা দিতেছেন, যদিও স্বরাজ বলিতে আরও উচ্চস্তরের জিনিষ বুঝায়। স্বরাজ অধীনতার স্পর্শশূন্য পুরাদস্তর রাষ্ট্রভিন্ন আর কিছু নয়।

---

(১৪)

স্থানীয়শাসনকর্ত্তৃত্ব।

রাষ্ট্রসংক্রান্ত যাবতীয় কাযের পরিচালনার ভার শাসনচক্রের উপর। কিন্তু কাযের প্রত্যেকটির গুরুত্ব সমান নয়। কতকগুলি কায এমন আছে,

যাহা স্মারা রাষ্ট্রের স্বার্থসম্পৃক্ত; (যেমন, সেনা-সংরক্ষণ, বাণিজ্য-শুল্ক নিদ্ধারণ)। আর কতকগুলি কায এমন আছে,যাহা কেবল স্থানীয় কতকগুলি লোকের স্বার্থসম্পৃক্ত, তাহাতে সারা রাষ্ট্রের স্বার্থের অতি ঘনিষ্ঠ বা স্পষ্ট যোগ নাই; (যেমন, কোন সহরবাসীদের জন্য ছোট-বড় নানাপ্রকার রাস্তা প্রস্তুত করা, পুকুর কাটানো, সেতু বানানো)। আবার কতকগুলি কায এমন আছে, যেগুলিতে স্থানীয় লোকেরও যেমন সারা রাষ্ট্রবাসীরও তেমনি স্বার্থের যোগ আছে আর সমান পরিমাণেই আছে; (যেমন, বিদ্যা-প্রচার, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, নদী-খাল-বিল প্রভৃতির সংস্কার)।

এই-যে তিন শ্রেণীর কায, ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কাযগুলি শাসনচক্র নিজের হাতে রাখিয়া দেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাযগুলি স্থানীয় হওয়ায়, উহাদের ভার তাঁহারা স্থানীয় প্রজাদের প্রতিনিধিদের হাতে কখনও সম্পূর্ণরূপে আর কখনও বা আংশিকভাবে ছাড়িয়া দেন। আর তৃতীয় শ্রেণীর কাযগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা কতকগুলি সাধারণ কার্য বিধি স্থির করিয়া লইয়া সেই বিধি অনুযায়ী কায করিবার ভার কতকটা নিজেদের উপর রাখেন আর কতকটা স্থানীয় প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কায করিবার ভার যেসকল প্রজাপ্রতিনিধিরা পান, তাঁহাদিগকে স্থানীয়কর্ত্তৃপক্ষ বলা চলে। ইংরেজীতে তাঁহাদের নাম লোকাল গবর্মেণ্ট।

স্থানীয়কর্ত্তৃপক্ষেরা সাধারণত প্রজাপ্রতিনিধি হইলেও, কোন কোন রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রাভাসে তাঁহারা শাসনচক্রের নিয়োজিত কর্ম্মচারী মাত্র, আর কোন কোন রাষ্ট্রে তাঁহাদের কেহ কেহ প্রজাপ্রতিনিধি আর কেহ কেহ বা শাসনচক্রের নিয়োজিত কর্ম্মচারী।

যে রাষ্ট্রে প্রজাপ্রতিনিধিরাই স্থানীয়শাসনকর্ত্তৃত্ব পান, সে-রাষ্ট্রকে বহু-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে; আর যে-রাষ্ট্রে শাসনচক্রের নিয়োজিত কর্ম্মচারীদের

উপরই সে-ভার থাকে, সে-রাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক বলে। যে-রাষ্ট্রে, প্রজা-প্রতিনিধি ও রাজপুরুষ উভয়েই একযোগে স্থানীয়শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন, সে-রাষ্ট্রকে মিশ্রকেন্দ্রিক বলা চলে। মার্কিন বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত; ইংলণ্ডও বহুপরিমাণেই বহুকেন্দ্রিক। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত ফ্রান্স। প্রুসিয়া রাজ্যকে মিশ্রকেন্দ্রিক বলা চলিত।

আমাদের এখানে যাহাকে ম্যুনিসিপাল কৌন্সিল, লোকাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানমতে তাহাই স্থানীয়কর্ত্তৃপক্ষ। স্থানীয়কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে সাধারণত বিচার বা শাসনের কোন ক্ষমতা থাকে না। রাস্তা-ঘাট তৈয়ারি করা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, আলো ও জলের বন্দোবস্ত করা, নিজের এলাকাভুক্ত স্থানটি যাহাতে রোগ-বীজের হাত হইতে রক্ষা পায় সেজন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করা—এইরূপ সব কাযই তাঁহারা করিয়া থাকেন।

স্থানীয়কর্ত্তৃপক্ষদের এলাকা কতদূর পর্য্যন্ত হওয়া উচিত, এ-সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। একই রাষ্ট্রে নানাবিধ এলাকা দেখা যায়, কোন এলাকা হয়ত মাত্র আড়াই শত বিঘা লইয়া আর কোন এলাকা হয়ত পঁচিশ হাজার বিঘা লইয়া। এইসব এলাকা রাষ্ট্রকার্য্য চালাইবার সুবিধার জন্য প্রায়ই আপনাহইতেই স্থির হইয়া যায়। কোথাও বিভিন্ন শহর বা গ্রাম আগে গড়িয়া উঠিয়াছে, তারপর সেগুলির সমবায়ে একটি বড় রাষ্ট্র হইয়াছে; আবার কোথায় একটি বড় রাষ্ট্র আগে গড়িয়া উঠিয়াছে, তারপর রাষ্ট্রপ্রজারা যেখানে যেমনভাবে উপনিবিষ্ট হইয়াছে, সেইখানে তেমনি করিয়া এক একটি কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ সব কর্ম্মকেন্দ্রের নাম সকল রাষ্ট্রে সমান নয়। কোথাও শহর, কোথাও শায়ার, কোথাও পারিশ, কোথাও কম্যুন, কোথাও কাণ্টন, কোথাও ক্রিজ, কোথাও জেমিন্দ আর কোথাও বা আর-কিছু।

এইসব কর্ম্মকেন্দ্রের খরচা স্থানীয় লোকদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করা হয়। ব্যবসায়ের লাইসেন্স (বা অধিকার) দিয়া, ঘাটের ইজারা দিয়া, সেতুর উপর দিয়া যাহাকিছু যায় তাহারই জন্য কিছুকিছু আদায় করিয়া, বাজার হইতে দান তুলিয়া, আলো প্রভৃতির জন্য খাজনা বসাইয়া, গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি গৃহপাল্য জানোয়ার এবং গাড়ী, সাইকেল, নৌকা প্রভৃতি রাখিবার অধিকার দিয়া এবং হয়ত প্রত্যেক বাড়ীর উপরও কিছু কিছু খাজনা বসাইয়া এবং আরও নানাউপায়ে স্থানীয়কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের খরচা তুলিয়া লন। কোথাও কোথাও এমনও দেখা যায়, কর্ম্মকেন্দ্রে যেসকল দ্রব্য বাহির হইতে আনা হয় সেসকল দ্রব্যের জন্য আর কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্য দিয়া যেসকল দ্রব্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায় সেই সকল দ্রব্যের জন্যও একটা দান তোলা হয়। কোথাও কোথাও মদ, ভাং, তাড়ি প্রভৃতির দোকান ইজারা দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ খরচার জন্য টাকা তুলেন।

যে-কর্ম্মকেন্দ্র যেমন, সে-কর্ম্মকেন্দ্রের আয়ও তেমনি। ছোট কর্ম্মকেন্দ্রের আয় অল্প, কার্য্যভারও সেই অনুসারে অল্প। বড় কর্ম্মকেন্দ্রের আয় অধিক, কার্য্যভারও সেইমত অধিক হইয়া থাকে। একটা কর্ম্মকেন্দ্রের পক্ষে একটা পাঠশালা চালান, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও সংস্কার করা ভিন্ন অন্যকাযে হাত দিবার হয়ত সামর্থ্যই থাকে না, আবার কোন কর্ম্মকেন্দ্র হয়ত হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত চালাইতে পারে।

(১৫)

সম্প্রদায়গত শাসনকর্ত্তৃত্ব।

যে-যে রাষ্ট্রে পার্লিমেণ্ট্রী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, সেই সেই রাষ্ট্রেই সম্প্রদায়গত শাসনকর্ত্তৃত্বের প্রথা ক্রমশ প্রচলিত হইয়াছে। এই স ব প্রথার অনুকূলে প্রধান যুক্তি এই-যে, সব মানুষের (তথা সব রাষ্ট্র-প্রজার) মত একবিধ নয়। তাহাদের কেহ কেহ প্রাচীন বিধিব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তনের অভিলাষী ; ইহাদিগকে ইংরেজীতে 'রিয়্যাক্‌শনারী' বলে ; বাঙ্গালায় ইহাদের নাম পশ্চাদ্‌গমনেচ্ছু সম্প্রদায় রাখা যাইতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রে ইহাদের নাম 'ইরিকন্‌সিলিএব্‌ল'। কেহ কেহ বা বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায় ; ইহাদিগকে ইংরেজীতে কন্‌জারবেটিব্‌' ও বাঙ্গালায় রক্ষণশীল সম্প্রদায় বলা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থার সংস্কার-অভিলাষী ; ইহাদিগকে ইংরেজীতে 'লিবার্‌ল' ও বাঙ্গালায় সংস্কারেচ্ছু সম্প্রদায় বলা চলে। 'লিবার্‌ল' শব্দের অনুবাদ সাধারণত উদারনীতিক করা হয় ; কিন্তু বোধ হয়, 'উদারনীতিক' শব্দ অপেক্ষা 'সংস্কারেচ্ছু' শব্দটি অধিকতর সঙ্গত। চতুর্থ শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থা একেবারে তুলিয়া দিতে বা আমূলসংস্কার করিতে চায় ; ইহাদের ইংরেজী নাম 'রাডিকাল' আর বাঙ্গালা নাম আমূলশোধনেচ্ছু। এই-যে চারিশ্রেণীর লোক, ইহারা সময়ে সময়ে কোন কার্য্যবিশেষের জন্য একমত ও একজোঠ হইলেও সাধারণত আলাদা থাকিতেই উৎসুক। এই ঔৎসুক্য হইতেই চারিটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যে-সম্প্রদায় যখন নিজের মত বহু রাষ্ট্রপ্রজার নিকট আপাতত গ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারে এবং প্রতিনিধিনির্ব্বাচনকালে অধিকসংখ্যক রাষ্ট্রপ্রজাকে নিজেদের দলে টানিয়া আনিতে পারে, সেই সম্প্রদায়ই তখন কার্য্যত প্রাধান্য লাভ করে এবং রাষ্ট্রের নায়কত্ব করিবার অধিকারী হয়। অনেক সময় বিভিন্ন

দলগুলি প্রায় সমানসংখ্যক রাষ্ট্রপ্রজাকে দলে টানে এবং কাজেই প্রাধান্যে সমান থাকে; তখন রাষ্ট্রের নায়কত্ব করিতে হইলে দুইটি বা তিনটি দলের মিল ঘটান আবশ্যক হয়। এই মিলিত সম্প্রদায়ই তখন রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে।

অনেক সময় মতগত মৌলিক পার্থক্যই যে বিভিন্ন দলের উদ্ভবের কারণ, তাহা নহে। রাষ্ট্রবাসিদের আর্থিক সমস্যার সমাধান ব্যাপার লইয়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ঘটিতে পারে, যেমন ইংলণ্ডের লেবরপার্টি বা শ্রমিক সম্প্রদায়। রাষ্ট্রবাসীরা বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইলে, স্ব স্ব সমাজের স্বার্থরক্ষা লইয়াও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, যেমন অধুনালুপ্ত জর্ম্মন-সাম্রাজ্যের সেমাইট-বিরোধী, আলশাস-লোরেনের স্বাতন্ত্র্যবাদী, পোলজাতির হিতেচ্ছু প্রভৃতি সম্প্রদায়। ধর্ম্মমতগত পার্থক্য লইয়াও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়; যেমন ইতালীতে কাথলিক যাজক সম্প্রদায়। কোন নূতন ব্যবস্থার প্রচলন চেষ্টা লইয়াও সম্প্রদায়ের গঠন হয়, যেমন ইংলণ্ডে য়্যুনিষ্ট পার্টি (আয়র্লণ্ডের সহিত বৃটিশ দ্বীপের বর্ত্তমান যোগরক্ষনেচ্ছু সম্প্রদায়)। আবার, এমনও দেখা যায়, কেবল দলের জন্যই দল গঠিত হয়—কোন মতগত পার্থক্যের জন্য নয়। এই শ্রেণীর দল বা সম্প্রদায়কে কৃত্রিম বলা চলে। মার্কিন ফ্রান্স ও ইতালী প্রভৃতি দেশে এইরূপ অনেক কৃত্রিম সম্প্রদায় আছে। তাহাদের মতের কোন স্থৈর্য্য নাই; সুবিধামত তাহারা কথনও এদলে আর কথনও ওদলে যোগ দেয়, দিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। কৃত্রিম সম্প্রদায়গুলি শাসনকর্ত্তৃত্বটাকে একটা ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া উহার মর্য্যাদার ও গুরুত্বের খর্ব্ব করিয়া থাকে। এইরূপ সম্প্রদায় গঠনে রাষ্ট্রের ক্ষতি ভিন্ন হিত যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে যাহারা যখন শাসনকর্ত্তৃত্ব পায়, তখন তাহারা সারা রাষ্ট্রবাসীর স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের নীচ স্বার্থটাকেই বড়

করিয়া দেখে। অথবা, ইহারা শাসনকর্তৃত্ব না পাইলে রাষ্ট্রনায়ক যাঁহাদের সাহায্যে শাসনকর্তৃত্ব চালাইতে থাকেন, তাঁহাদের প্রভাব অপ্রতিহত হইয়া উঠে।

শাসনকর্তৃত্বলাভের জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অস্থায়ী সম্মিলন ঘটে, তাহার ইংরেজি পারিভাষিক নাম—'কোয়ালিশন'। 'কোয়ালিশন মিনিষ্ট্রীকে' বাঙ্গলায় মিলনাত্মক বা মিলীভূত মন্ত্রিসমাজ বলা চলে। মিলীভূত মন্ত্রিসমাজ ইংলণ্ডে একাধিকবার গঠিত হইয়াছে। ফ্রান্স ও ইতালীর সম্প্রদায়গুলি সংখ্যাধিক্যের জন্য দুর্ব্বল হওয়ায় শাসন-কর্তৃত্ব লাভের আশায় মিলিত হইতে বাধ্য হয়। কাজেই এই দুই রাষ্ট্রে মিলীভূত মন্ত্রিসমাজ বিরল ঘটনা নহে।

মিলনাত্মক মন্ত্রিসমাজের স্থায়িত্ব ততদিন, যতদিন মিলিত সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে মনোমালিন্য বা স্বার্থসংঘর্ষের বিশেষ কোন কারণ উপস্থিত না হয়। মনোমালিন্যের বা স্বার্থসংঘর্ষের অবকাশ বাঁচাইয়া চলিতে না পারিলে এইরূপ মন্ত্রিসমাজ যে-কোন মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এই কারণেই রাষ্ট্রমধ্যে সম্প্রদায়ের সংখ্যা যত কম হয়, ততই ভাল। অকারণে বা সামান্য কারণে সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়াইলে লাভ অপেক্ষা কার্য্যকালে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। সম্প্রদায়সংখ্যা অধিক হইলে; কোন সম্প্রদায়ই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবল হইতে পারেনা, সুতরাং উহা অপরসম্প্রদায়ের সাহায্য-ও-সহযোগিতা-নিরপেক্ষ হইয়া শাসনকর্তৃত্ব লইতে পারেনা। ফলে, সাধারণ রাষ্ট্রপ্রজারা অনুকূল থাকিলেও মন্ত্রিসমাজের পক্ষে অনেক সময় কোন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না, সে-কাযে বহু অনাবশ্যক বাধা পাইতে হয়। সম্প্রদায়গুলি যদি কেবল সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে গঠিত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের সমবেত মত কেবল সুবিধাবোধদ্বারাই পরিচালিত

হয়, তাহাহইলে সম্প্রদায়গুলির সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের অহিত-ভিন্ন হিতের সম্ভাবনা কোথায়? বৃহত্তর স্বার্থ তো সেরূপস্থলে ক্ষুদ্রতর স্বার্থের নিকট যখন-তখন অপমানিত হইতে থাকে। যে-রাষ্ট্রে এইরূপ স্বার্থসর্ব্বস্ব সম্প্রদায়ের আধিক্য, সে-রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইবেই হইবে।

যাঁহারা সম্প্রদায়গত শাসনকর্ত্তৃত্বের বিরোধী, তাঁহাদের একটি যুক্তি এই-যে, সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হওয়ায় নিজের স্বাধীনবুদ্ধির অনুযায়ী মত প্রকাশ করিতে পারেনা, ফলে তাহাদের প্রত্যেকের মনে কৃত্রিমতার ও ভণ্ডতার একটা ছাপ পড়িয়া যায়; যে নিজে দাসপ্রথার বিরোধী, তাহাকে হয়ত সম্প্রদায়ের খাতিরে দাসপ্রথার সমর্থন করিতে হয়, অর্থাৎ তাহাকে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী হইয়া হাঁ-স্থলে না এবং না-স্থলে হাঁ বলিতে হয়। এই যুক্তির বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, যাহাদিগকে অন্নের জন্য পরের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় সেইসব লোকদিগকে যদি হিসাবের মধ্যে না আনা হয়, তাহাহইলে দেখা যায় নিজের মতে যাহার বিশ্বাস প্রবল, সে তো অনায়াসেই মতানুকূল সম্প্রদায়ে যোগদিতে পারে ও দিয়া থাকে; যে সংস্কারেচ্ছু তাহাকে কেহ জোর করিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়ে ধরিয়া রাখেনা, আর যে রক্ষণশীল তাহাকে কেহ আমূলশোধনেচ্ছু সম্প্রদায়ে থাকিতে বাধ্য করে না। সে-ইচ্ছা করিলেই সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারে। আর, এরূপ সম্প্রদায়-পরিবর্ত্তন করাও তো একটা বিরল ব্যাপার নয়। গ্লাডোষ্টোনের মত লোকও মত-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাইটোরী সম্প্রদায় হইতে পিলাইট সম্প্রদায়ে এবং পরে লিবারল সম্প্রদায়ে যোগ দেন এবং শেষে নিজে এক নূতন সম্প্রদায়ের গঠন করেন, সে-সম্প্রদায়ের নাম হয় গ্লাডোষ্টোনিয়ন লিবারল। মতপরিবর্ত্তন হেতু একেবারে রক্ষণশীল সম্প্রদায় হইতে ক্রমে আমূলশোধনেচ্ছু সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছেন, এমন ব্যক্তির

দৃষ্টান্তও বোধ হয় ইতিহাসে যথেষ্ট আছে। যাঁহাদের প্রকৃতি সবল ও সবল, তাঁহারা কেন-যে সম্প্রদায়ের খাতিরে 'হাঁ' কে 'না' ও 'না' কে 'হাঁ' বলিতে বাধ্য হইবেন তাহা বুঝা যায় না।

আবার এমনও তো দেখা যায় যে, মতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নামটির অর্থ পর্য্যস্ত বদলাইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের টোরী ও হুইগ এই দুই সম্প্রদায়ের নাম করা যাইতে পারে। ষ্টুয়ার্ট আমলে টোরীদের মত ছিল, রাজার শাসনক্ষমতা ভগবদ্দত্ত, সে-ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার অধিকার প্রজাদের নাই; হুইগেরা কিন্তু সে-মতবাদে বিশ্বাস করিত না, তাহারা প্রজাদের স্বার্থের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিয়া রাজার বিশিষ্টাধিকারগুলি খর্ব্ব করিবার পক্ষপাতী ছিল। কাজেই টোরীদিগকে তখন রাজ্ঞীয় দল আর হুইগদিগকে পার্লিমেণ্ট্রী দল বলা যাইতে পারিত। একদল রাজার আর অপর দল পার্লিমেণ্টের ক্ষমতাবৃদ্ধিসাধনের পক্ষে ছিল। তাহাদের কাহাকেই এখনকার মত স্বভাবত রক্ষণশীল বা সংস্কারেচ্ছু সম্প্রদায় বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। রক্ষণশীলতা বা সংস্কার—কোনটাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। রাজা-প্রজার মৌলিক সম্বন্ধ লইয়াই তাহাদের যতকিছু বিরোধ। এইজন্যই যখন ষ্টুয়ার্ট বংশের পরিবর্ত্তে হানোবর বংশীয় রাজারা ইংলণ্ডের সিংহাসন পাইলেন, তখন টোরীরা হইয়া গেল নূতন রাজাদের বিরোধী; কারণ, তাঁহারা প্রজাদের প্রদত্ত সত্বে স্বত্ববান্, ভগবদ্দত্ত স্বত্বে নহেন, তাঁহাদের সিংহাসন-প্রাপ্তিতে পার্লিমেণ্টেরই জয়জয়কার। আর তখন হুইগেরা, যাহারা পার্লিমেণ্টের ভক্ত ছিল, তাহারা হইয়া গেল নূতন রাজাদের ভক্ত। ফলে টোরীরা ক্রমে পার্লিমেণ্ট্রী সম্প্রদায় আর হুইগেরা রাজ্ঞীয় সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। ক্রমে তৃতীয় জর্জ্জের আমল হইতে হুইগেরা সংস্কারের ও অগ্রসরণের আর টোরীরা শৃঙ্খলা ও নিরা-

পন্থের পক্ষপাতী হইয়া উঠে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তাহারা যথাক্রমে সংস্কারেচ্ছু ও রক্ষণশীল সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইয়া উঠে। শেষে এই দুই সম্প্রদায় হইতে বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে রক্ষণশীল সম্প্রদায় পর্য্যন্ত কার্য্যত সংস্কারেচ্ছু হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্রের সংস্কারসূচক বহু নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে। ফলে তাহারা 'রক্ষণশীল'। এই বিশেষণের সার্থকতা হইতেও বঞ্চিত হয়। এখন কি তথাকথিত রক্ষণশীল আর কি তথাকথিত সংস্কারেচ্ছু উভয় দলের লোকই যে-কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রকার মতই পোষণ করিয়া থাকে।

সম্প্রদায়গত শাসনব্যবস্থার একটা প্রধান দোষ এই-যে, যাঁহারা শাসনকর্তৃত্ব পান, তাঁহারা যদি বৃহত্তর স্বার্থবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হন, তাহাহইলে যাহারা তাঁহাদের মতানুসারী নহে, তাহাদিগকে তাঁহারা নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে পারেন এবং লোকে যাহাতে নিঃসঙ্কোচে মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারে ও যাহাতে দলবদ্ধ হইয়া কায করিতে না পারে, এজন্য নানা বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া রাষ্ট্রের সহজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, ফলে রাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে একটা বিপ্লববুদ্ধি জাগাইয়া তুলিতে পারেন। এজন্য সম্প্রদায়গত শাসনব্যবস্থা কেবল সেইসব রাষ্ট্রেরই হিতকর, যেসকল রাষ্ট্রে প্রজারা জড়বুদ্ধি বা উদাসীন প্রকৃতি নহে, দেশের অবস্থা বুঝিবার মত বিদ্যা এবং অবস্থা বুঝিয়া চলিবার মত উদ্যম রাখে, নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ অপেক্ষা দশের স্বার্থকে শ্রদ্ধা করিতে জানে এবং দশের হিতের জন্য নিজের স্বার্থকে বলি দিতে পারে, এককথায় যথার্থ দেশাত্মবোধদ্বারা অনুপ্রাণিত।

---

(১৬)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও শাসনচক্রের কর্ত্তব্য।

ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ পক্ষে সাহায্য করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তবে এই সাহায্য লৌকিক সাহায্য। রাষ্ট্রের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর হাত হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে না পারিলে রাষ্ট্রবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ থাকিতে পারেনা, ফলে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করিতে থাকায় কি ব্যক্তির আর কি সমাজের কাহারও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কাজেই রাষ্ট্রকে প্রবল ও দুর্জ্জেয় করিয়া রাখিবার দিকে তীব্র নজর রাখাই শাসনচক্রের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এই প্রধান কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে শাসনচক্রকে আরও অনেকগুলি কার্য্যে হাত দিতে হয়; যেমন, রাষ্ট্রবাসিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান। প্রজারা শিক্ষিত না হইলে, রাষ্ট্রের মর্য্যাদা তাহারা মনেপ্রাণে বুঝিতে না শিখিলে, বৃহত্তর স্বার্থের নিকট ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বলিদিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া তুলিতে না পারিলে, বিপদ কালে তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ শাসনচক্রের পক্ষে সহজসাধ্য (আর কখন বা সম্ভবপরও) হয় না। পক্ষান্তরে, প্রজারা যদি সুস্থ না হয়, নিত্য রোগে রোগে যদি জর্জ্জরিত হইতে থাকে, দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে যদি মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া উঠে, তাহাহইলে সেই দুর্ব্বল প্রজাদিগকে লইয়া রাষ্ট্ররক্ষা কখনই সম্ভবপর হয় না। এইজন্য প্রজারা যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে এবং নিত্য পেট ভরিয়া খাইতে পায়, এরূপ বিধান করাও শাসনচক্রের অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠে।

এই দুই কর্ত্তব্যের খ্যাতিরেই 'যেমন-চলছে-চলুক-নীতি' অমান্য করিয়া চলা শাসনচক্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। 'যেমন-চলছে-চলুক' নীতি মানা তখনই সম্ভবপর হয়, যখন রাষ্ট্রবাসীরা সকলে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দ্বারা আর প্ররোচিত হয় না, যখন তাহাদের সকলেই পরস্পরের হিতের জন্য ব্যাকুল. যখন পরের হিতসাধনকেই শ্রেষ্ঠকর্ম্ম বলিয়া সকলের মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রবাসিদের সেরূপ মানসিক উন্নতি যতদিন না ঘটিতেছে, ততদিন এই নীতি অনুসারে চলিতে চাহিলে শাসনচক্রের ধর্ম্মহানি ঘটে; কারণ, এই নীতির দোহাই দিয়া দুর্দ্দান্ত প্রবল ব্যক্তিরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে উৎপীড়িত করিতে থাকিবে, আর পররাষ্ট্রের বণিকেরা আসিয়া প্রজাদের ধনসম্পত্তি সহজেই হরণ করিয়া লইয়া যাইবে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় 'যেমন-চলছে-চলুক-নীতি' মানিয়া চলা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। ইংলণ্ডকেও এই সত্য ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। আজ ইংলণ্ড ক্রমশ অবাধবাণিজ্য-নীতি ত্যাগ করিতেছে আর নানারূপ বাণিজ্যবিধান প্রস্তুত করিয়া প্রবলের হাত হইতে দুর্ব্বল প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। কারখানা-সংক্রান্ত আইন ইংলণ্ডকে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বিধিবদ্ধ করিতে হয়। এই আইন 'যেমন-চলছে চলুক' নীতির বিরোধী। এই নীতির দোহাই দিয়া ইংলণ্ডের কারখানাগুলিতে যে-সব অমানুষিক অত্যাচার চলিত, তাহার বর্ণনা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অধুনা কয়লা-কুলীদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজকে যে-সকল ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, সে-সকল যে এই নীতির অবমাননাকর তাহা বলাই বাহুল্য।

অবাধবাণিজ্যনীতি কোন রাষ্ট্রেরই পক্ষে মঙ্গলকর নয়। একদিন পণ্ডিতদের মনে এই ভাব জাগিয়াছিল যে, যে-দেশে যে-জিনিষ অপেক্ষাকৃত

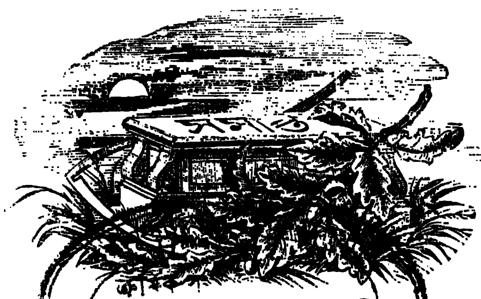
সস্তায় উৎপন্ন হয়, সেই দেশ সেই জিনিষ উৎপন্ন করিতে থাকিলে, প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হইবে, ফলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধসম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এখন সকলেই এই যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন। যে-কোন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংগ্রাম বাধিলেই যাবতীয় রাষ্ট্রকেই অকারণ কষ্ট পাইতে হয় এবং আবশ্যক দ্রব্যের অভাবে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রই যতটা সম্ভব নিজের নিজের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ থাকুক, ইহাই এখনকার সঙ্গতনীতি। এই নীতি অবাধবাণিজ্য নীতির বিরোধী। এই নীতি-অনুসারে প্রত্যেক শাসনচক্রের দেখা উচিত, যাহাতে পররাষ্ট্রের পণ্য আসিয়া স্বরাষ্ট্রের পণ্যগুলির স্থান অধিকার না করে। পররাষ্ট্র হইতে যাহা আসিবে তাহা যেন অভাব-পূরণ-স্বরূপ হয়; স্বরাষ্ট্রে যাহা উৎপন্ন করিতে পারা যায় না, কেবল তাহাই পররাষ্ট্র হইতে আসুক। এইরূপ করিতে হইলে শুল্কব্যবস্থা শাসনচক্রের হাতে থাকা দরকার এবং পররাষ্ট্রীয় পণ্যের উপর আবশ্যকমত উচ্চ শুল্ক বসাইবার অধিকার থাকাও তাঁহাদের আবশ্যক।

তারপর, বাণিজ্যসংক্রান্ত, প্রভু-ভৃত্য-সংক্রান্ত, সম্পত্তির হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয়েও নানারূপ আইন বিধিবদ্ধ করা শাসনচক্রের কর্ত্তব্য। এই সমস্ত আইন অবশ্য যাহাতে প্রজাদের যথার্থ হিতসাধক হয়, এইরূপ ভাবে গঠন করা আবশ্যক। নহিলে আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রজারা যাহাতে সুখাদ্য পায়, স্বচ্ছন্দে থাকে, রোগের হাতে না পড়ে এবং রোগের হাতে পড়িলে শীঘ্র চিকিৎসার সুবিধা পায়—এই সমস্ত বিষয়েও লক্ষ্য রাখা শাসনচক্রের কায। এজন্য অবশ্য যে-সমস্ত উদ্যোগ আবশ্যক, সেই সমস্ত উদ্যোগের কতক ভার তাঁহারা প্রজাদের হাতে

তুলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রজারা সেই ভার কিরূপ নিষ্ঠার সহিত বহন করিতেছে তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যেখানে প্রজাদের ত্রুটি ঘটিবে, সেইখানেই প্রজাদের সাহায্য করিতে থাকিবেন। প্রজাদের সহযোগিতা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিলেই তাঁহাদের গৌরব। প্রজারা যতবেশী আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে, শাসনচক্রের কাযের ভার ততই কমিবে এবং রাষ্ট্রের দুর্জ্জেয়ত্ব ততই বাড়িবে।

সেই-সকল রাষ্ট্র বাস্তবিকই প্রবল, যে সকল রাষ্ট্রের প্রজারা শাসনচক্রের কার্য্যের ভার কমাইয়া লইয়া নিজেদের কার্য্যভার বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক এবং ক্রমে ক্রমে শিক্ষাদান, জলব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নতি-সাধন, চিকিৎসাব্যবস্থা প্রভৃতি নানা কায একেবারে নিজেদের হাতে লইয়া আসে। তাহাদের এইসব কার্য্যভারেরই নাম স্বায়ত্তশাসন (বা কংগ্রেসের ভাষায় স্বরাজ)। যে-রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা যত বেশী, সে-রাষ্ট্র সভ্যতার দিকে তত বেশী অগ্রসর। এককেন্দ্র শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা বহুকেন্দ্র শাসনব্যবস্থা বহুগুণে শ্রেয় আর তাহা প্রজাদের উৎকর্ষবোধক।



পরিভাষা

(বর্ণানুক্রমিক)

অখণ্ড-সম্মিলিত-রাষ্ট্র—Federation
অধীনপ্রজা—Subject
অনুগ্রহাত্মক শুল্কহার—Preferential rate of duty.
অবাধপ্রভুতন্ত্র—Despotism.
অভিজাততন্ত্র—Aristocracy.
অভিজাতসভা—House of Lords.
আইন—Law.
আত্মকর্তৃত্ব—Selfgovernment, liberty.
আত্মবৈশিষ্ট—Self determination.
আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধান—International Law.
আমলাতন্ত্র—Bureaucracy.
আমূলশোধনেচ্ছু—Radical.
ইতরজনতন্ত্র—Mobrule, ochlocracy (সেকালের Democracy)
উপজাতি—Tribe.
একরাষ্ট্র—Unitary State.
একেন্দ্রিক—Centralised.
একেশ্বরতন্ত্র—Monarchy.
একব্যবস্থাপক রাষ্ট্র—Unicameral State.
এলাকা—Jurisdiction.
কুরাজতন্ত্র—Tyranny.
কুযাজকতন্ত্র—Idolocracy.

গোত্র, গোষ্ঠী—Clan, Totem
গণতন্ত্র—Democracy. (সেকালের Polity)
গঠনপদ্ধতি—Constitution.
গৃহকর্তৃত্ব—Patriarchal.
জগদ্রাষ্ট্র—World state.
জাতীয় সংসৎ—National assembly
জাতি—People, race.
জীব—Organisation.
দ্বিব্যবস্থাপক রাষ্ট্র—Bicameral State.
দেবতন্ত্র—Ideocracy.
দেশরাষ্ট্র—Country state.
ধর্ম্মসঙ্ঘ—Church.
নগররাষ্ট্র—City state.
নাকচ করিবার ক্ষমতা—Veto.
নিবারণী শক্তি—Veto.
নির্ব্বাচনাধিকার—Franchise
নৈতিকবিধান—Ethics.
পশ্চাদ্গমনেচ্ছু—Reactionary, irreconciliable.
পিতৃনাম্নী—Patriarchal.
প্রজাসৈন্য—Militia.
প্রজাতন্ত্র—Republic
প্রজার সম্মতিগ্রহণ প্রথা—Referendum.

প্রজার অনুমোদন গ্রহণ প্রথা / প্রজার মতানুসন্ধান প্রথা } Plebicite.
ভগবদ্দত্ত অধিকার—Divine right.
মন্ত্রিসভা—Cabinet.
মাতৃনামী—Matriarchal.
মিলীভূত মন্ত্রীসমাজ—Coalision ministy.
মৌলিকবিধান—Constitutional law.
যথেচ্ছাচার তন্ত্র—Despotism.
যাজকতন্ত্র—Theocracy.
যেমন চলছে চলুক নীতি—The doctrine of Laissez fair, Let-alone policy.
রক্ষণশীল—Conservative.
রাজতন্ত্র—Monarchy.
রাষ্ট্র—State.
রাষ্ট্রক—Commonwealth, (a member of federal state)
রাষ্ট্রসমাজ—Nation.
রাষ্ট্রপ্রজা—Citizen.
রাষ্ট্রপ্রভু—Sovereign.
রাষ্ট্রগুচ্ছ—Confederation.
রাষ্ট্রসংহতি—League of nations
রাষ্ট্রাভাষ—Pseudo-state.
লোকাচার—Custom.
বহুকেন্দ্রিক—Decentralised.
বিশিষ্টাধিকার—Prerogative.
বিশিষ্টপ্রজাসভা—Senate.
বিশিষ্টপ্রজাতন্ত্র—Aristrocracy.
বিশিষ্টকুরাজতন্ত্র—Oligarchy
বৈধরাজতন্ত্র—Constitutional monarchy.
শাসনকার্য্য—Administration
শাসনচক্র—Government.
শাসনপদ্ধতি—Government.
শাসনপরিষৎ—Executive Council.
সঙ্ঘ—Organisation.
সঙ্ঘবদ্ধ—Organised.
সংস্কারেচ্ছু—Liberal.
সমাজ—Society, People
সমিতি—Society, Association, Committee.
সভানায়ক—Speaker.
সহজে পরিবর্ত্তনসাধ্য—Flexible.
সহজে পরিবর্ত্তন-অসাধ্য—Rigid.
সম্মিলিতরাষ্ট্র—Federation.
সম্প্রদায়গত শাসনকর্ত্তৃত্ব—Party Government.
সার্ব্বভৌম ব্যবস্থা—Imperialism.
সামন্ততন্ত্র—Feudalism.
স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব—Liberty, liberties.
স্বরাজ—State, (কংগ্রেসের মতে—Colonial Self Government).